মেদিনীপুর সিটি কলেজ, বাংলা বিভাগ আয়োজিত

একদিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র : ২০২৩

সংক্ষেপিকা সংকলন:

বাংলা সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যচর্চা : বহুমাত্রিক চেতনায়

তারিখ :

২রা জুন, ২০২৩ (শুক্রবার)

তত্ত্বাবধায়ক:

অভ্যন্তরীণ মূল্যমান নির্ণায়ক অনুষদ (IQAC)

মেদিনীপুর সিটি কলেজ

স্থান:

এ. পি. জে. আব্দুল কালাম প্রেক্ষাগৃহ

মেদিনীপুর সিটি কলেজ, কুতুরিয়া, ভাদুতলা-৭২১১২৯, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

মেদিনীপুর সিটি কলেজ, বাংলা বিভাগ আয়োজিত

একদিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র : ২০২৩

সংক্ষেপিকা সংকলন:

বাংলা সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যচর্চা : বহুমাত্রিক চেতনায়

তারিখ :

২রা জুন, ২০২৩ (শুক্রবার)

তত্ত্বাবধায়ক:

অভ্যন্তরীণ মূল্যমান নির্ণায়ক অনুষদ (IQAC)

মেদিনীপুর সিটি কলেজ

স্থান:

এ. পি. জে. আব্দুল কালাম প্রেক্ষাগৃহ

মেদিনীপুর সিটি কলেজ, কুতুরিয়া, ভাদুতলা-৭২১১২৯, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

মেদিনীপুর সিটি কলেজের বাংলা বিভাগ এবং

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল সোসাইটি

আয়োজিত একদিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে

প্রকাশিত প্রবন্ধের সংক্ষেপিকা সংকলন

VIDYASAGAR UNIVERSITY

Professor Pabitra Kumar Chakrabarti
Vice-Chancellor

Date: 17.05.2023

MESSAGE

I am happy to learn that the 1st International Conference on "*বাংলা সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যচর্চা: বহুমাত্রিক চেতনায়*" is going to be organized by the Department of Bengali, Midnapore City College, Bhadutala, Paschim Medinipur on 2nd June, 2023.

I commend this collective endeavour and hope that the deliberations in the Conference will really be enriching to all the participants.

I convey my best wishes for the success of the same.

18/05/2023

(Professor Pabitra Kumar Chakrabarti)

Dr. Pradip Ghosh,
Director,
Midnapore City College,
Kuturiya, Bhadutala,
Paschim Medinipur – 721 129

Midnapore 721102 West Bengal India
Telefax: (03222) 275329 (Office)
E-mail: vc@mail.vidyasagar.ac.in

VIDYASAGAR UNIVERSITY

P.O. : Vidyasagar University, Midnapore - 721 102, Dist.: Paschim Medinipur,
West Bengal, INDIA.

Dated : 24.05.2023

MESSAGE

I am very happy to learn that the Midnapore City College, Kuturiya, Bhadutala, Midnapore in the District of Paschim Medinipur, affiliated to Vidyasagar University, is going to publish an Abstract Book on the occasion of organising first (1st) International Conference on " **বাংলা সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যচর্চা : বহুমাত্রিক চেতনায়** "organised by the Department of Bengali of the said college on Second June Two Thousand Twenty Three (02.06.2023) in the college premises. I extend my best wishes to the College Authority, all members of the Department of Bengali and other associated members for taking necessary steps for the publication of such a book which will inspire to the teachers, students and others.

I hope that the programme for publication of the Abstract Book and also the International Conference will be a grand success.

24/05/23

(Dr. J. K. Nandi)

Registrar.

Registrar
Vidyasagar University
Midnapore - 721102
West Bengal, India

To
Dr. Pradip Ghosh
Director,
Midnapore City College,
Kuturiya, Bhadutala,
Midnapore,
Dist. : Paschim Medinipur,
Pin : 721 129.

Telephone : (03222) 298220, Fax : (03222) 275297 / 275329
e-mail : registrar@mail.vidyasagar.ac.in/regis_admin@mail.vidyasagar.ac.in

অধিকর্তার শুভেচ্ছাবার্তা

দেখতে দেখতে আমাদের প্রিয় মেদিনীপুর সিটি কলেজ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই সপ্তম বর্ষে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছে, তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে আমি সবার কাছে অনুরোধ করছি। শুধু সেমিনার নয়; সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের লেখা সংকলিত ISBN যুক্ত Peer Review গ্রন্থ লেখকদের হাতে তুলে দেওয়াও আমাদের উদ্দেশ্য। আসলে এই সেমিনারে এমন এক বিষয় নির্বাচিত হয়েছে যে মানবিকী বিদ্যার সমস্ত শাখার ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক-গবেষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা এখানে লেখা দিয়ে শংসাপত্র পেতে পারেন। তাই আমি মনে করি এটা ওঁদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। প্রত্যেকের মধ্যে সম্ভাবনা প্রচুর থাকে; তাই যাঁরা আজীবন জ্ঞানচর্চার মধ্যে নিয়োজিত থাকতে চান তাঁদের এই সেমিনারে অংশগ্রহণ অনেকাংশেই বাধ্যতামূলক বলে আমি মনে করি। এই সেমিনারের সহযোগিতায় রয়েছেন দি গোরী কালচার অ্যান্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন। তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। শুভেচ্ছা জানাই অংশগ্রহণকারী সহায়তাকারী সমস্ত ব্যক্তিবৃন্দের যাঁরা আমাদের পাশে রয়েছেন।

শুভেচ্ছান্তে

ড. প্রদীপ ঘোষ

অধিকর্তা, মেদিনীপুর সিটি কলেজ

Campus: Kuturiya, Bhadutala, Midnapore, Paschim Medinipur, Pin- 721129, West Bengal, India
Phone: +91 9932318368, +91 8967598946
Website: www.mcconline.org.in
E-mail: director@mcconline.org.in

শুভেচ্ছাবার্তা

কলমকে সঙ্গী করে সৃষ্টির আনন্দে সৃজনশীলতায় ধরা দেয় ব্যক্তিত্ব। আর সেটা যদি হয় সাহিত্যের মাধ্যমে তবে তো ষোলকলা পূর্ণ। এখানে মানবমুখী চিন্তন তথা সাহিত্যভাবনা বহুমুখী মাত্রায় ধরা পড়ে। আর এই সৃজনশীল লেখার প্রতিভাকে মেলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছে মেদিনীপুর সিটি কলেজের বাংলা বিভাগ। সাধুবাদ জানাই বাংলা বিভাগের এই উদ্যোগকে। তাঁদের উদ্যোগে একদিবসীয় যে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে, তাতে একটি ISBN সম্বলিত Peer Reviewed গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। এই গ্রন্থে ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক-গবেষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের লিখিত সৃজনশীল চিন্তন আপনাদের মুগ্ধ করবে এই আশা রাখি। আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী, প্রাবন্ধিক, আলোচক, সর্বোপরি আয়োজকদের মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে হার্দিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সেমিনারে সহযোগিতা করেছেন দি গোরী কালচার অ্যান্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন। তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। সর্বোপরি অভিনন্দন জানাই এই মহাবিদ্যালয়ের অধিকর্তা ড. প্রদীপ ঘোষ মহাশয়কে। যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই মহাবিদ্যালয় উত্তরোত্তর বিকশিত হচ্ছে। সকলকে আবার শুভকামনা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তার সমাপ্তি টানলাম।

ধন্যবাদান্তে

ড. কুন্তল ঘোষ

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ

সম্পাদকীয় কলমে

একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তি বিস্তারের সঙ্গে বিকাশ ঘটাতে হবে শুভবোধ ও মঙ্গল চিন্তার। বিচ্ছিন্নতা, অমঙ্গল, হিংসা, বিদ্বেষ এসবের অস্তিত্বকে ভুল প্রমাণিত করার দায়িত্ব মানুষেরই। তাই প্রয়োজন পারস্পারিক আদান প্রদান, অভিন্নতা, সংযুক্তি। এইজন্য আমরা এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছি, যার উদ্দেশ্য বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে মিলন বা কল্যানবোধের জাগরণ ঘটানো। আলোচনাচক্রের বহুমাত্রিক চেতনায় যা রূপ নেবে আন্তসাংস্কৃতিক বা 'Interculture' এর আদর্শ বিস্তারের।

সর্বপ্রথমে ধন্যবাদ জানাই মেদিনীপুর সিটি কলেজের কর্ণধার মাননীয় ড. প্রদীপ ঘোষ মহাশয়কে; তাঁর অনুপ্রেরণা ও নিরন্তর উৎসাহে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সুন্দর ও সাবলীল গতি পেয়েছে। তাঁর দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব, নমনীয় মনোভাব ও স্নেহশীলতা আমাদের এই কর্মে উদ্যম ও সাহস জুগিয়েছে; এই জন্য আমরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

হাজারো সুখ দুঃখের মাঝে এই দিনটা আমাদের কাছে খুব আনন্দের। এই দিন আমরা আলোচনাচক্রের সাথে সাথে লেখক বন্ধুদের হাতে গ্রন্থটি তুলে দেবো। তবে এই আনন্দের ভাগীদার শুধু আমরা নই আপনারা প্রত্যেকে - যাঁরা এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন, নিজেদের মূল্যবান লেখা দিয়েছেন, আর নেপথ্যে থেকে যাঁরা আলোচনাচক্রটি এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছেন তাঁরাও। আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এঁদের প্রত্যেকেই। ধন্যবাদ জানাই দি গোরী কালচার অ্যান্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের। যাঁরা কম্পিউটারের সামনে ঝাপসা চোখ নিয়েও লেখাগুলো দ্রুততার সাথে একত্রিত করে গ্রন্থাকারের রূপ দিতে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের এই শ্রম ছাড়া এত দ্রুত প্রায় নির্ভুল ভাবে এই গ্রন্থ আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম না।

আপনারা সকলেই জানেন পত্রিকা প্রকাশ করতে গেলে কিছু ভুল ত্রুটি অনিবার্য। তাই এই ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মার্জনা করবেন এই আশা রাখি।

আমরা সবাই জানি চেষ্টা মানুষকে অগ্রগতির দিকে ঠেলে দেয়। এই চেষ্টাকে সম্বল করে আমরা আগামী দিনে আরো সৃজনশীলতার দিকে এগিয়ে যেতে পারবো এই অঙ্গীকার করে সম্পাদকীয় কলমের ইতি টানছি।

ধন্যবাদান্তে

ড. রাকেশ জানা ও অভি কোলে

উপদেষ্টা মণ্ডলী

১) ড. প্রদীপ ঘোষ (Founder Director, Midnapore City College)

২) ড. কুন্তল ঘোষ (TIC, Assistant Professor, Dept. of Paramedical and Allied Health Science)

৩) ড. শ্রাবণী প্রধান (Assistant Professor, Dept. of Paramedical and Allied Health Science)

৪) ড. সুচিস্মিতা রায় (Assistant Professor, Dept. of Paramedical and Allied Health Science)

৫) ড. শান্তনু কর মহাপাত্র (Associate Professor, Dept. of Paramedical and Allied Health Science)

৬) ড. অর্পিতা রাজ (Assistant Professor, Dept. of Humanities)

৭) ড. রাকেশ জানা (Assistant Professor, Dept. of Humanities)

৮) শ্রী অভি কোলে (Assistant Professor, Dept. of Humanities)

৯) শ্রী স্বপন হাজরা (Assistant Professor, Dept. of Humanities)

১০) শ্রী বিশ্বজিৎ মল্লিক (Assistant Professor, Dept. of Humanities)

১১) শ্রী জগন্নাথ সামন্ত (Assistant Professor, Dept. of Humanities)

১২) শ্রী অভিষেক দাস (Asst. Registrar)

১৩) শ্রী শুভময় দাস (Accountant)

১৪) শ্রী আশিষ কুমার বারিক (Asst. Librarian)

১৫) শ্রীমতি মৌমিতা রায় (Cashier)

১৬) শ্রী হারু পাত্র (Office Assistant)

১৭) শ্রী সুমন মল্লিক (Graphic Designer & IT)

১৮) শ্রী রামশেখর মুখোপাধ্যায় (Exam cell Member)

১৯) শ্রী সুমন চৌধুরী (Exam cell Member)

২০) শ্রীমতী শম্পা দাস বেরা (Asst. Accountant)

বিজ্ঞানচেতনা ও রবীন্দ্রনাথ

অনিরুদ্ধ বারিক

ছাত্র, বাজকূল মিলনী মহাবিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানব এবং তাঁর দর্শন যে 'বিশ্বদর্শন' সে ব্যাপারে আজ একুশ শতকেও কারো কোনো সংশয় নেই। তবে জগৎ পরিভ্রমণকারী রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বদর্শন বুঝতে হলে শুধু সাহিত্য কিংবা দর্শন চেতনাই যথেষ্ট নয়,তার জন্য চাই প্রকৃত অর্থে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান মানসকে বোঝা।কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ঘটে না। কারণ বেশিরভাগ রবীন্দ্রগবেষক কিংবা কবি-সাহিত্যিকরা বিজ্ঞান থেকে দূরে থাকেন। আবার উল্টোদিকে যারা বিজ্ঞান চর্চা করেন তারা সাধারণত (তবে সবাই নয়) সাহিত্যের দিকে খুব একটা আগ্রহ দেখান না। তবে এ কথা তো সত্যি, সাহিত্য মানুষের জীবন, তার সংস্কৃতি, তার পরিবেশ তথা সমাজ জীবনের দর্পণ। আর মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যায় বিজ্ঞান বর্তমানে একটি অপরিহার্য বিষয়। সুতরাং সেই সূত্র ধরে বিজ্ঞান সমাজেরও একটি অবিচ্ছেদ অঙ্গ। তাই বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে একটি যোগসূত্র থাকাটা স্বাভাবিক।আমরা এ প্রবন্ধে সেই যোগসূত্রটি খোঁজবার একটু চেষ্টা করব মাত্র।

এটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার। তাই এখানে বিষয়টির একটি আবছা রূপ দেবার জন্য আমরা একটি গান ও একটি কবিতার কিছু অংশের উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করব।

আমাদের প্রত্যেকেরই অত্যন্ত প্রিয় একটি গান – 'ওরে গৃহবাসী,খোল্, দ্বার খোল্' গানটির কথাই ধরা যাক।এ গানের একটা জায়গায় বলা হচ্ছে—

"মৌমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা,
মাধবীবিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্।।"

এখানে একটু সজাগ দৃষ্টি ফেললে আমরা বিজ্ঞানের দুটো বিষয়কে পাবো -১) মিথস্ক্রিয়া আর ২) জনন। মৌমাছি ও ফুল এদের দুজনেরই দুজনকে দরকার। মৌমাছির দরকার ফুলকে খাদ্যের জন্য,আর ফুলের দরকার মৌমাছিকে তার পরাগমিলনের জন্য। এই যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বা এই যে দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক, বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলে মিথোজীবিতা বা অপর কথায় সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ (Symbiotic Relationship)। আবার ফুলের গন্ধের ও সৌন্দর্যের সঙ্গে আছে সরাসরি জননের সম্পর্ক। সৌন্দর্য মুগ্ধ করে আর গন্ধ করে আকর্ষণ। দুয়ের প্রভাবে ঘটে পরাগমিলন। যার ফলে ভাবীকালের অস্তিত্ব সূচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এই অবসম্ভাবী ও শাশ্বতকালীন খেলাটিকে কি সুন্দর ভাবেই না গানের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

এবার কবিতারও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। চৈতালি কাব্যগ্রন্থের সভ্যতার প্রতি কবিতাটির দিকে একটু দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়-

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী;
দাও সেই তপোবন, পুণ্য ছায়ারাশি।
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ,সেই শান্ত সাম গান।"

—পৃথিবীজুড়ে সর্বত্র যে পরিবেশ দূষণ ও 'হিউম্যান ইকোলজি' অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে বর্তমানে যে ভীষণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা,তারই একটি আশঙ্কা ফুটে উঠেছে এই কবিতার মধ্যে। এ কবিতা সহজাত রবিন্দ্র মানসের পরিবেশ সচেতনতাবোধের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্তমান দিনে এই বৃহৎ ও ধ্বংসাত্মক সমস্যার আলোচনা সর্বত্র হচ্ছে। আয়োজন করা হচ্ছে নানা সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের - এর থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজবার জন্যে। আলোচনা হচ্ছে আমাদের ঘরবাড়ি কেমন হওয়া উচিত, গোচারণভূমি না থাকার ফলে গবাদি পশুদের কী অসুবিধা হচ্ছে কিংবা জ্বালানির প্রয়োজনে দ্বিধাহীনভাবে বৃক্ষ নিধনের দরুন সাংঘাতিক ফল কী হতে পারে তাই নিয়ে। অথচ ভাবলে অবাক লাগে, আজ থেকে প্রায় শত বৎসর আগেই ঠিক এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে গিয়েছেন কবি আলোচ্য কবিতার মধ্যে। সুতরাং এ কথা বুঝতে অসুবিধে নয় যে আধুনিক কালে হিউম্যান ইকোলজির কথা সর্বপ্রথম যারা চিন্তা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাদের মধ্যে অন্যতম।

এভাবে রবীন্দ্র রচনার বৃহৎ সম্ভারের মধ্যে একটু সজাগ দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে,কি অনন্য বিজ্ঞান সাধক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই রবীন্দ্রনাথকে আমরা যেন খণ্ডিত রূপে না দেখে সামগ্রিকভাবে দেখি-এ প্রবন্ধের তাই উদ্দেশ্য। তাহলে এই বিশ্ব মানবের 'বিশ্বদর্শন'-এর মধ্যে কি সুবিপুল বিজ্ঞান চেতনা লুকিয়ে আছে তার একটি কিঞ্চিত হলেও ধারণা লাভ করতে পারব।

বস্তুবাদ ও দেহবাদ : প্রসঙ্গ, বাউল গান

অন্তরা ব্যানার্জি

গবেষক (পি এইচ ডি), বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কালপর্ব, তার সঙ্গে জুড়ে যাওয়া অসংখ্য যুগসঞ্চিত ইতিহাসের আলোচনা আজও বাংলার এক সুবিশাল গবেষণারত অধ্যায়। আমাদের এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধের সীমায়িত শব্দসংখ্যায় তা ব্যক্ত হবার নয়, তাই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বর্তমানে শুধু বেছে নিতে চাইছি বাউলের চর্চা ও চর্যার বস্তুবাদী এবং দেহবাদী পরিসরটিকে। আমাদের এই প্রবন্ধে 'বাউল' শব্দেই আপামর লোকায়ত ভাবধারার দেহবাদী, গুরুমুখী সাধকদের চিহ্নিত করব এবং তাঁদের গানে, তাঁদের চর্চায় কেমন করে বস্তুবাদী এবং দেহবাদী চিন্তার প্রতর্ক জুড়ে রয়েছে তা আলোচনা করব।

বহু প্রাচীন কাল ধরেই বস্তুবাদী দর্শনের বিষয়টি আমাদের সাহিত্যে প্রবাহিত রয়েছে। পরবর্তীকালের দার্শনিক, তাত্ত্বিকেরা যে প্রক্রিয়ায় বস্তু, আত্মা, দেহ কিম্বা চেতন-অচেতনকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ধারণ করেছেন, তা আমাদের প্রাচীন বস্তুবাদে ছিল না। বাউল-ফকির মতাদর্শে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কথাই স্বীকৃত হয়েছে। ইন্দ্রিয়কে বাদ দিয়ে নয়, বরং তার অভ্যাস এবং যথাযথ চালনাতেই সিদ্ধিলাভের কথা বলা হয় এই মতে। দেহ গঠনে যে পঞ্চতত্ত্বের কথা জানা যায় তা উপনিষদ এবং প্রাচীন আয়ুর্বেদে স্বীকৃত। চরক সংহিতায় যে দেহগঠনের প্রস্তাবগুলি ছিল তার সঙ্গে দেহবাদী দর্শনের মিল পাওয়া যায়।

তবে এখান থেকেই আমাদের গবেষণা প্রবন্ধের আলোচনার সূত্রপাত। যে বাউলরা ধর্মের শৃঙ্খল ভেঙে ভিন্নতর একটি লোকায়ত আদর্শে তাঁদের নিজস্ব মানবতাকে প্রচার করেন, তাঁরাই আবার আরশীনগরে এসে মনের মানুষের সন্ধান করেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বাসী বস্তুবাদী আদর্শের সঙ্গে এই দ্বন্দ্বে দেহতত্ত্বের পথে বাউল-ফকিরের চিন্তার বিরোধ। কারণ অনুমানসর্বস্ব চিন্তা থেকে যত দূরেই যাবার কথা তাত্ত্বিক প্রয়োজনে বলা হোক না কেন, অনুমান নির্ভরতা থেকে কখনওই সম্পূর্ণ মুক্তি সম্ভব নয়। দেহতত্ত্বের সাধনায় বিশ্বাস করা হয় দেহই জাগতিক-অজাগতিক সমস্ত শক্তির আধার। দেহই ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসকেন্দ্র। যাকে তাঁদের পারিভাষিক ভাষায় 'দেহব্রহ্মাণ্ডবাদ' বলে অভিহিত করা হয়।

এ'প্রসঙ্গে এ'ও বলা প্রয়োজন যে, এইধরণের গবেষণাকর্মে ক্ষেত্রসমীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রমুখ বাউলের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ও তাঁদের পদের আলোচনার ব্যবহারে উঠে আসবে এই পরিসরের নানা দিক।

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে আমরা মননশীল বাউলদের গানের মধ্যে ধর্মবর্জিত একটি বিশ্বচৈতন্যের বোধ বিষয়ে আলোচনা করব। আমরা দেখব আপাত বিরোধী দুটি প্রতর্ক কেমন করে একই সঙ্গে

সহাবস্থান করেছে এই গানগুলিতে। জীবনের মধ্যে নানা সময়ে ঘটে চলা নানান দ্বন্দ্বের সমাবেশের মতোই সাহিত্যেও এমন বৈপরীত্যের ছাপ থেকে যায়। একদল সাধক-কবি-গায়েন, তাঁরা জীবনের প্রতি মুহূর্তে সন্ধান প্রয়াস করে চলেছেন বিশ্বলোকের পথে। সন্ধান করতে গিয়ে তাঁদের জীবন থেকে বহুসময় বহুকিছু সংগৃহীত হয়ে উঠে আসবে করে এইই তো ধর্ম। সেই জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞতার সংগ্রহ যে সর্বদা একমাত্রিক হবে তা কখনও নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তাই এই বৈপরীত্য, এই দোলাচল, যুগপৎ বাউল জীবনেরই বৈপরীত্য।

রবীন্দ্র উপন্যাস ‘চতুরঙ্গ’ : অন্তঃবাস্তবতা উন্মোচনে ভাষার নিপুন প্রয়োগ

অভি কোলে

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

মেদিনীপুর সিটি কলেজ

কুতুরিয়া, ভাদুতলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলা তথা ভারতীয় উপন্যাসে নূতন রীতির প্রবর্তন করলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা তথা ভারতীয় উপন্যাসে চতুরঙ্গ একটি সম্পূর্ণ মাত্রা যোজনা করল। বাস্তবতা থেকে উপন্যাস এখানে অন্তঃবাস্তবতায় উন্নীত হল। রবীন্দ্রনাথ সর্বাঙ্গীণ আধুনিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন তিনটি আয়ুধ— অবচেতন, প্রতীক ও সংলাপ। ‘চতুরঙ্গে’র ভাষা ঠিক চলতি ভাষা নয়, সাধু ভাষাও নয় তার চেয়ে কিছু বেশি। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের আঙ্গিকগত নতুনত্বকে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছে তার ভাষা। তীক্ষ্ণ তীব্র মর্মভেদী অনুভূতিগাঢ় ভাষারীতি এই উপন্যাসের ভাষায় এনেছে হীরকদ্যুতি। চরিত্রগুলির অনুভূতি, চেতন ও অবচেতনলোকের ভাবনা, বহমান ভাবাবেগ ও স্মৃতি, অনুষঙ্গে জেগে ওঠা নানা বিচূর্ণ ভাব প্রকাশের যোগ্য বাহন যে ভাষা তা বিশিষ্ট, প্রতীকী তাৎপর্যে অন্বিত, গভীর ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। এই উপন্যাসে চরিত্র স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করেছে চেতন থেকে অবচেতনে, অবচেতন থেকে চেতনে। তাদের চেতনাস্রোত অবচেতনাস্রোতে ভেসে-ওঠা বিচ্ছিন্ন মুহূর্তসমূহের যোগ্য বাহন এই ভাষা। শচীশের পূর্ণতা অন্বেষণ, দামিনীর তীব্র জীবনাসক্তি, শ্রীবিলাসের আত্মগোপনকারী ভূমিকা রূপায়িত হয়েছে এই ভাষায়।

চিত্রকল্পধর্মী সংকেতবাহী ভাষার মাধ্যমে লেখক প্রকাশ করেছেন শচীশ ও দামিনী নামক দুই অসামান্য পাত্রপাত্রীর মনের রুদ্ধ কামনা, অস্থির চিত্তবিক্ষোভ, হৃদয়ের তীব্র আর্তি; আরো প্রকাশ করেছেন পাত্র-পাত্রীর মনের অবচেতন স্তরের নানা রহস্য। জীবনের অন্তঃবাস্তবতার রহস্যময় অন্বেষণকে প্রকাশের মাধ্যম যে ভাষা, তা কাব্যময় ও রহস্যময়।

(ক) চারিদিকে ধু ধু করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলিও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে। (শ্রীবিলাস ২)

এখানে নিসর্গদৃশ্য পেয়েছে গূঢ় তাৎপর্য, তা এসেছে নিসর্গের উপর প্রাণীস্বভাব আরোপের ফলে। সমস্তটা মিলিয়ে সংকেতবাহী। বস্তুসংস্থান ও মনোভাবের অন্তর্বয়নে বর্ণনাংশ পেয়েছে লোকোত্তর পরিব্যাপ্তি।

(খ) সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না। (শ্রীবিলাস ৪)

উৎপ্রেক্ষা, উপমা-যোগে আর একটি নিসর্গচিত্র সাংকেতিক তাৎপর্যে অন্বিত হয়ে উঠেছে।

'চতুরঙ্গে'র বাইরের সাধুভাষা-রূপের অন্তরালে স্পন্দিত হয়েছে চলিতরীতির প্রাণধর্ম। তার পরিচয়স্থল সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, ইডিয়মের প্রয়োগে। যেমন,—

১) সমাপিকা ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সীমিত করা অথবা লুপ্ত করা:

'পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড়ো আড়ত', 'যেখানে তার আবদার সেখানেই তার জোর', 'শচীশের একি চেহারা', 'চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কো-খুসকো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা'।

২) চলিত সর্বনাম পদের বহুল ব্যবহার: তা, তাকে, তার, যাতে ইত্যাদি।

৩) সাধুভাষার সঙ্গে ইডিয়ম-ধর্মী কথাশব্দ বা চলিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার :

'ফস্ করিয়া', 'পা-টেপানো', 'তামাক-সাজানো', 'পেটমোটা পুরুত পাণ্ডা', 'ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা', 'বেরো', 'গেছে'।

'চতুরঙ্গে'র ভাষারীতিতে উপন্যাসের অন্তর প্রকৃতি প্রতিভাত হয়েছে। চৈতন্যের গভীরতম সংকটকে ব্যক্ত করার অন্যতম মাধ্যম হল কাব্যময় প্রকাশ। সেই কারণেই কাব্যময়তা তথা গূঢ় ব্যঞ্জনাশক্তিকে আশ্রয় করেছে, অবলম্বন করেছে, সংকেতবহ উপমা-উৎপেক্ষা-রূপক-সমৃদ্ধ প্রতীকী চিত্রময়তাকে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে লেখক ভাষাকে নানা কাজে ব্যবহার করেছেন। এ ভাষায় স্পন্দিত হয়েছে প্রাণধর্ম, চেতন ও অবচেতনের নানা গূঢ় ব্যঞ্জনা। ব্যঞ্জনাধর্মী অন্তঃবাস্তবতার প্রতীকধর্মী বাহনরূপে ভাষার ব্যবহার হয়েছে।

শোক থেকে শ্লোক : হাসান আজিজুল হকের "আগুন পাখি"

অভি দাস

ছাত্র, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সময় হল চল্লিশের দশক। এই সময় সারা দেশ উত্তাল। বহু নারকীয় তান্ডব চালিয়েছে, এবং চলেছে এই সময়। তার কিছু প্রভাব আমরা বাংলা উপন্যাস, ছোটোগল্পে দেখতে পাই। সেইরকমই একটি উপন্যাস হল হাসান আজিজুল হকের "আগুন পাখি"। সময়পর্বে লেখা না হলেও সেই সময়কালকে অবলম্বন করে লেখা এই উপন্যাস। মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগের একটি বিচিত্র রূপ আমরা উপন্যাসে পাই। এই উপন্যাসটির কথক হলেন একজন নারী। এটি একটি আত্মসমীক্ষণ মূলক উপন্যাস। উপন্যাসটির অর্ধেকাংশে মেজবউ একান্নবর্তী পরিবারের গৃহবধূ। স্বামী সন্তান এবং পরিবার নিয়ে তার জীবন। তার নাড়িছেঁড়া ধন বড়ো ছেলের মৃত্যু সংবাদ আমরা উপন্যাস মধ্যে পাই। সেই মৃত্যু শোকের যন্ত্রণার চিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন মেজো বউ নামক কথকের মুখে। যে একসময় ছিল চার দেওয়ালে বন্দিনী পাখির মতো, সেই মেজো বউ বড়ো খোকার মৃত্যুর ফলে শোকাতুরা হয়ে মেলে দিয়েছে ডানা। এবং উপন্যাস গড়ে উঠেছে এক অনন্য স্বাদের। লেখায়, বলায়, বাক্যে, চিত্রে তার এক ভিন্ন স্বাদ। আগুন পাখি উপন্যাসের মেজো বউয়ের মুখনিঃসৃত বাণী মন্ত্র হয়ে শ্লোকে পরিণত হয়েছে। বাংলা সাহিত্য চিরকাল এই মেজো বউ নামক কথককে স্মরণে রাখবে।

চল্লিশের দশকের প্রেক্ষাপটে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

ড. অরিত্র বাগ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শিউনারায়ণ রামেশ্বর ফতেপুরিয়া কলেজ, মুর্শিদাবাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৭-১৯৭০ খ্রীঃ) বিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে লিখতে শুরু করেছিলেন। তাঁর ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ ইত্যাদি যুগব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষের ছবি। একদিকে তিনি যেমন দেখেছিলেন তৎকালীন ধনী ব্যবসায়ীদের যারা অর্থের লোভে খাদ্য, বস্ত্র লুকিয়ে রাখে, অন্যদিকে দেখেছিলে দরিদ্র হাভাতে মানুষদের যারা সারাদিন খাদ্যের সারিতে দাঁড়িয়েও গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করতে পারে না। এমন কয়েকটি গল্প হল 'হাড়', 'দুঃশাসন', 'নিশাচর', 'নক্রচরিত', 'ভাঙাচশমা' ইত্যাদি। এই গল্পগুলিতে চল্লিশের দশকের বেদনারক্তিম অধ্যায় ধরা পড়েছে।

ধর্ম সমন্বয়ের কাল ও চিহ্ন : প্রসঙ্গত দক্ষিণ রায় ও গাজি খাঁ'র আখ্যান

অরিন্দম অধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজ

বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা হয় মুসলমান আক্রমণের মধ্যে দিয়ে। এই আক্রমণ বাংলার হিন্দু সমাজকে করেছিল পরাজিত। একই সঙ্গে শুরু হয়েছে বিধর্মী শাসকের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় প্রতিরোধ। তবে এই বিরোধের পরিবেশ সমাজে, বিশেষ করে নীচের স্তরে বেশি দিন টেকেনি। সেখানে চলছিল ধর্মগত সমন্বয়ের কাজ। সামন্ততান্ত্রিক শাসনে ক্লিষ্ট বাঙালির কাছে ধর্মীয় কলহের মূল্য ছিল কম। এর সঙ্গে ছিল নিজ নিজ ধর্মের ধর্মীয় প্রভুর অত্যাচার। সেই সমাজে দাঁড়িয়ে নিম্ন শ্রেণির মানুষের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল ধর্মীয় সমন্বয়ের বার্তা। মধ্যযুগের সাহিত্যেও এই সমন্বয়ের ছবি উঠে এসেছে দক্ষিণ রায় এবং গাজি-কালু পির ও বন-বিবির প্রসঙ্গে। সেখানে হিন্দু পুজো করেছে মুসলমানের পিরকে। আবার মুসলমান দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করেছে দক্ষিণ রায়কে। এমনই ছিল মধ্যযুগের ধর্মীয় সমন্বয়ের ছবিটা।

মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' : মুণ্ডাদের সামাজিক জীবন ও ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্বেষণ

অরূপ সিং

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নারায়ণগড় সরকারী মহাবিদ্যালয়

ভারতবর্ষের প্রাচীন জাতি রূপে আদিবাসীদের একটা বিশেষ অবদান আছে, যাদের বিচরণ ক্ষেত্র সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে পার্বত্য অধ্যুষিত অরণ্য অঞ্চলে। সরকার এদের অবহেলার চোখে দেখলেও কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদের চোখে এঁরা সমান মহিমা নিয়ে ধরা দিয়েছে। ফলে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল, ভিল, হো, বিড়হড় প্রভৃতি আদিবাসী উপজাতির জীবনচিত্র শিল্পীর চিত্রকলা হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে শিল্পী রামকিংকর বেইজ 'সাঁওতাল দম্পতি'র স্থাপত্য চিত্র অংকন করে অমরত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। এছাড়া শত সহস্র কবি সাহিত্যিকরা তাদের রচনায় আদিবাসীদের জীবন চিত্র অংকনে তৎপর হয়ে তাদের প্রতি সহমর্মিতাবোধ পোষণ করেছেন। তবে এই সহমর্মিতাবোধ আজকের নয় প্রাচীনকাল থেকে এর সাক্ষ্য মেলে। পশ্চিমবঙ্গের ৩৮টি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে মুণ্ডা সম্প্রদায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী। আমরা জানি প্রত্যেক গোষ্ঠী তার নিজস্ব সামাজিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত। বাংলা উপন্যাসে প্রথম আদিবাসী সমাজ জীবনের প্রভাব দেখা যায় তিরিশের দশকে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এ,

চল্লিশের দশকে তারাশঙ্করের 'কালিন্দী'তে আর সত্তরের দশকে মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মুণ্ডা জাতির সম্যক পরিচয়ের মধ্যেই মুণ্ডাদের সামাজিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির চিত্র ফুটে উঠেছে। অন্যান্য উপজাতির মত মুণ্ডাদেরও আছে সামাজিক পরিকাঠামো, আছে নির্দিষ্ট আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, পুরাণ, ঈশ্বর। মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মুণ্ডাদের সামাজিক জীবন, কৃষ্টি ও তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্বেষণই আমার গবেষণা কর্মের প্রয়াস।

ব্রতকথা : নারী মনস্তত্ত্বের আলোকে

অর্জুন কুমার দাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

ঈপ্সিত কামনা পূরণার্থে মূলত নারীদের দ্বারা যে লৌকিক অনুষ্ঠান সমাজে পালিত হয় তাকেই বলে ব্রত। ব্রতের প্রধান চারটি অঙ্গ— কামনা, ক্রিয়া, ছড়া ও ব্রতকথা। শাস্ত্রীয় তথা পৌরাণিক ও অশাস্ত্রীয় তথা লৌকিক উভয় ব্রতেরই ব্রতকথা আছে। শাস্ত্রীয় ব্রত ও ব্রতকথাগুলি শাস্ত্রের নানা বিধি-বিধান ও পুরোহিতের দ্বারা অনেকখানি আরোপিত। কিন্তু লৌকিক তথা মেয়েলি ব্রতকথাগুলিতে একান্তভাবে বাঙালি নারী মনের কামনা-বাসনার কথা উঠে এসেছে। সংসার জীবনে বাপ, ভাই, স্বামী, শ্বশুরকে সন্তুষ্ট করে; স্বামীর কোলে সন্তান দিয়ে এক গলা গঙ্গা জলে নিজের মৃত্যু প্রত্যাশা করেছে। আসলে ব্রতকথাগুলিতে বঙ্গললনাদের স্নিগ্ধ মাতৃ মূর্তিটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কুমারী ব্রত পালনের মাধ্যমে যেন পূর্ণাবয়ব নারী তথা মা হয়ে ওঠার প্রস্তুতিকেই লক্ষ করা যায়। এই ব্রতগুলি পালনের দ্বারা কিশোরীরা স্বপ্ন দেখে আগামী দিনের ভাবি সংসার, স্বামী ও সন্তানের। আগামী দিনে তাকেও যে বাপের বাড়ি ছেড়ে স্বামীর বাড়ি গিয়ে তাদের মঙ্গল কামনায় ব্রতী হতে হবে এ যেন তারই প্রস্তুতি। শুধু তাই নয়, এই ব্রত কথাগুলির মধ্যে বাঙালি নারী সমাজের গল্প শোনার আগ্রহ যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি লক্ষ করা যায় গল্প রচনার দক্ষতাও। নির্দিষ্ট দেব বা দেবীর ব্রতের ক্রিয়া করার পর ব্রতকথা শ্রবণ করলে পাঠক ও শ্রোতার সঙ্গে সঙ্গে পুরো পরিবারের কি কি উপকার হয় তাও বাতলে দেওয়া হয় ব্রতকথাগুলিতে। তবে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে ব্রত করলে বা ব্রতকথা পাঠ ও শ্রবণ করলে ব্রতীর বা ব্রতীনির পরিবারের কতটা ধন-সম্পদ বাড়ে বা সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে তা বলা কঠিন। তবে এগুলির দ্বারা বঙ্গরমণীরা যে তাদের চেতন ও অবচেতন মনের কামনা-বাসনার প্রতিফলন ঘটিয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে ব্রতকথাগুলির মধ্যে নারী মনস্তত্ত্বের এক বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

রাঢ়ের প্রবাদ দর্পণে ভাষার আনুষঙ্গিকতা

অর্পিতা চৌধুরী

অংশকালীন অধ্যাপিকা (স্যাক্ট), বাংলা বিভাগ

গৌরব গুঁইন মেমোরিয়াল কলেজ, চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর

লোকসাহিত্যের আঙ্গিকে কোনো নির্দিষ্ট জায়গার প্রবাদ আলোচনায় প্রথমেই লক্ষনীয় সেই অঞ্চলের উপভাষিক বৈশিষ্ট্যসমুহ। উপভাষিক বৈশিষ্ট্যসমুহকে বিশ্লেষন করতে গেলে যেটি প্রথমেই জানতে হয় সেটি হল ঐ স্থানের উৎপত্তির ইতিহাস। এ কারনে বাঁকুড়ার প্রবাদ আলোচনায় প্রথমেই রাঢ়ের উৎপত্তির ইতিহাস, রাঢ় অঞ্চলের প্রাচীনতা এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন বিভিন্ন অংশে রাঢ়ের উল্লেখ ও বর্তমান কাল পর্যন্ত দৈনন্দিন পরিভাষায় প্রাচীন শব্দগুলির ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবাদ হল অতি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অতি সংক্ষেপিত প্রকাশ। ফলে বাঁকুড়ার প্রবাদগুলিতেও তাদের দৈনন্দিন বিশ্বাস সংস্কারের ছাপ স্পষ্ট। আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারে প্রবাদগুলি আরো কাছের হয়ে উঠেছে। বোঝার সুবিধার্থে প্রবাদগুলিকে বিভিন্ন শ্রেনীতে বিভাজন করে নেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর গবেষণা মূলক নিবন্ধে বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া শহর এবং খাতড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদের উৎপত্তি, স্বরূপ এবং বর্তমান প্রবণতা বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস সাধিত হয়েছে। বলাবাহুল্য উক্ত অঞ্চলের প্রবাদ এবং প্রবাদ-অনুষঙ্গী শব্দাবলী বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ থেকে অদ্যাবধি কালের সাহিত্য–নির্মিতিকে অনিবার্য ভাবে প্রভাবিত ও পুষ্ট করে চলেছে।

বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে বিজ্ঞান ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ

অর্পিতা বারিক

ছাত্রী, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

মেদিনীপুর সিটি কলেজ, কুতুরিয়া, ভাদুতলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান। বিশেষ বিশেষ জ্ঞানে বিশেষজ্ঞরাই বিজ্ঞানী নামে পরিচিত। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যে দূরত্ব থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ সাহিত্য একটা কল্পনার বিষয়বস্তু যুক্তিসিদ্ধ মননের প্রকাশ। অপরটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণার মাধ্যমে স্বতঃসত্য আবিষ্কার করে মানব কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ।

সমাজের সবাইকে সমান অধিকার বন্টনের প্রচেষ্টায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা চালায় সমাজবিজ্ঞানীগণ। আর ভাষার মাধ্যমে দুর্বোধ্যতা দূর করার তাগিদে ভাবভাষা ও ভাবনাকে সহজ সরলভাবে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করার যে প্রচেষ্টা এবং কলাকৌশল অবলম্বন করে ভাষাকে উন্নত করেন ভাষা বিজ্ঞানী। আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গান, গল্প, কবিতা, উপন্যাস তথা লেখনীর মাধ্যমে তাকে সমাজবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানী বলতে অত্যুক্তি হবে না। তাই সমাজ থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে গেলে সমাজের ব্যক্তি মানস রবীন্দ্রনাথের পরশ পাওয়া যায়। যে মানুষের কল্পনায় বিপুল সত্য ও সৌন্দর্যের উদ্বোধন এবং সহজ সরল ভাষার মতো প্রকাশ করাই হচ্ছে রবীন্দ্র চেতনার বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষার মিলন (১৯২১) প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ গল্পের মাধ্যমে কৌশলে বিজ্ঞান চর্চায় মননিবাস করেন।

মধ্যযুগের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ

ড. আকবর আলি শাহ

রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, ক্যাটাগরি-I, ইতিহাস বিভাগ, গৌরব গুঁইন মেমোরিয়াল কলেজ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সুদীর্ঘ। এই সময়কালকে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগ। প্রাচীন যুগের সময়কাল ৯০০ – ১২০০ খ্রী!, মধ্যযুগ ১২০০ – ১৮০০ খ্রীঃ এবং ১৮০০ খ্রীঃ পরবর্তী সময়কাল আধুনিক যুগ। মধ্যযুগকে আবার উচ্চমধ্যযুগ কিংবা প্রাক চৈতন্যসহ উত্তরনের সময়কাল ১৩৫০ – ১৭০০ খ্রীঃ এবং শেষের মধ্যযুগ ১৭০০ – ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ। উক্ত বিষয়ের মধ্যে মুলত মধ্যযুগের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে সাহিত্যের বিকাশ আলোচিত হয়েছে যা মূলত মুসলমান শাসনের সাথে মিলে যায়।

উদারনীতিবাদের মূলতত্ত্ব, উৎস ও বিকাশ প্রসঙ্গে

মহঃ আমিরুল ইসলাম

সহ-শিক্ষক, ডিহিকোপা প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাঁইথিয়া চক্র, বীরভূম

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে উদারনীতিবাদ হলো রাষ্ট্রের কার্যাবলী ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। উদারনীতিবাদ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Liber' থেকে,-যার অর্থ হলো স্বাধীন। অধ্যাপক ল্যস্কির মতে, উদারনীতিবাদ হলো সমসাময়িককালের উপযোগী এমন একটি মতাদর্শ যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো স্বাধীনতা। উদারনীতিবাদের মূল লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতা করা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। শিল্পবিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ইত্যাদি বৈপ্লবিক ঘটনার মাধ্যমে ও আর্থ - রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উদারনীতিবাদ ক্রমশ বিকশিত হতে হতে জেরেমি বেন্থাম, জেমস মিল এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের হাতে তা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়। জন গ্রে (John Gray) তাঁর 'Liberalism' গ্রন্থে উদারনীতিবাদের বিকাশ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন এবং প্রাচীন গ্রিসে উদারনীতিবাদের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন। জে. এস. মিলের পূর্ববর্তী উদারনৈতিক তত্ত্বকে সাবেকি এবং মিলের পরবর্তী উদারনীতিবাদকে আধুনিক উদারনীতিবাদ হিসেবে গণ্য করা হয়। সাবেকি উদারনীতিবাদ অনুসারে ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি ইত্যাদি প্রাকৃতিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের স্বার্থে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম চুক্তিবাদী দার্শনিক জন লকের মতানুসারে জনগণের সম্মতিই হলো রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং জনকল্যাণ সাধনের জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। স্বাধীন জীবনযাত্রায় রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সাবেকি উদারনীতিবাদের আরও একজন বিশিষ্ট ইংরেজ দার্শনিক হলেন জেরেমি বেন্থাম। বেন্থামের মতে রাষ্ট্র হলো সকল অধিকারের উৎস এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক মঙ্গলসাধন(Greatest happiness of greatest number)। সাবেকি উদারনীতিবাদী অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ(Adam Smith) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদকে সমর্থন জানিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াক্ষেত্রকে সংকুচিত করে বাজার অর্থনীতি বা 'অবাধ নীতি'(Laissez faire) কে সমর্থন করেন।

যুগসন্ধিক্ষণের উদারনীতিবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর্থক জন স্টুয়ার্ট মিল উদারনীতিবাদ সম্পর্কে সুসংবদ্ধ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জে. এস. মিল রাষ্ট্রকে উপদ্রব জ্ঞান করলেও সীমিত ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি স্বীকার করেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল বেন্থামের উপযোগবাদের কিয়দংশ সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বটি যুগোপযোগী করে তোলেন। জে.এস. মিল তাঁর হিতবাদী তত্ত্বে নৈতিকতা এবং সামাজিক সুখ কামনা করেন। মিল গণতন্ত্রের সমর্থক হলেও সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুর স্বৈরাচার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কখনো চরম বা অপ্রতিহত বলে মনে করেননি।

বহুত্ববাদী তাত্ত্বিক অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি(H.Laski) তাঁর 'The State in Theory and practice' গ্রন্থে রাষ্ট্রকে একটি জাতীয় সমাজ (National Society) হিসাবে উল্লেখ করার পাশাপাশি সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ ও গোষ্ঠী সমূহের উপর বলপ্রয়োগের আইনসঙ্গত সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

উদারনৈতিক মতাদর্শে একচ্ছত্রবাদী চরম রাষ্ট্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক, দায়িত্বশীল এবং সীমিত ক্ষমতাবিশিষ্ট জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অপরিহার্যতাকে স্বীকার করা হয়েছে। উদারনীতিবাদ সাংবিধানিক ও আইনগত সংস্কারে বিশ্বাসী। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, আইনের অনুশাসন, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা, পরিকল্পিত উন্নয়ন, নগরায়ন ও আধুনিকীকরণ, শিক্ষার প্রসার, নাগরিক নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, দারিদ্রতা দূরীকরণ ইত্যাদি এই তত্ত্বের মূল লক্ষ্য।

রাষ্ট্রের কার্যাবলী এবং প্রকৃতি সম্পর্কিত উদারনৈতিক মতবাদকে অনেকেই অত্যন্ত নমনীয়, অস্পষ্ট, অপরিপক্ক, অপরিণত তত্ত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক ল্যাস্কি তাঁর 'Rise of European Liberalism'গ্রন্থ মন্তব্য করে বলেছেন, যে গতিতে ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উদারনীতিবাদের অগ্রগতি অব্যাহত ছিল পরবর্তীকালে সেই অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনায় উদারনীতিবাদের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অনস্বীকার্য। নিঃসন্দেহে মানবতাবাদী ধ্যান ধারণার বিকাশে উদারনীতিবাদ বিশ্বজুড়ে সাড়া জাগিয়েছিল।

অগ্নিজাতক : আলোকজ্যোতি ভাবনা

আশিস রায়

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

মাতৃগর্ভে একটি শিশু সন্তানের বেড়ে ওঠা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরে শিশুটি ভূমিষ্ট হয়। কিন্তু কিছু অসাধু ডাক্তার অতিরিক্ত টাকা পকটস্থ করার জন্য দ্রুত বাচ্চাটিকে ভুমিষ্ট করানোর জন্য সি-সেকশনের কথা বলে থাকেন, এর ফলে অনেক শিশুই ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। এই পদ্ধতির জন্য শুধুমাত্র ডাক্তারেরা দায়ী নয়, কিছু বাবা মায়ের আবার স্বপ্ন থাকে আমার শিশুটির জন্ম হোক শ্রীকৃষ্ণ যেদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন সেদিন অথবা জ্যোতিষশাস্ত্র মতে বিশেষ কোন দিনে এরফলে তারা বাধ্য হোন শিশুটিকে সময়ের আগেই বাস্তবের মাটিতে আনতে। ফলে ফলাফল হয় ভয়ানক। 'অগ্নিজাতক' নাটকে এটাই দেখানো হয়েছে। সব কিছুর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে। গায়ের জোরে কাউকে ভূমিষ্ট করা যায় না। যদি সেই চেষ্টা করা হয় তার ফল হয় মৃত্যু। যেটা আমাদের কারো কাম্য নয়। একইসঙ্গে যে শিশুটিকে বাস্তবে আনা হচ্ছে তাদের জন্য আমরা কোন পরিবেশ রেখে যাচ্ছি সেটাও আমাদের ভাবতে হবে। গোলাগুলি আর দাঙ্গার পরিবেশ থেকেও সমাজকে মুক্ত রাখার আবেদন জানাও হয়েছে নাটকে।

'মুখগুলি': পারিবারিক মূল্যবোধের অবনমন

উজ্জ্বল মণ্ডল

গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

আমাদের ভারতীয় তথা বাঙালিদের পারিবারিক জীবনে বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক বাৎসল্যের। উল্টো দিক থেকে সন্তানের ওপর বৃদ্ধ পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য বর্তায়। এটাই আমাদের অলিখিত সামাজিক নিয়ম। একুশ শতকের শুরু থেকে বাংলার গ্রামীন জীবনে ভাঙন লেগেছে। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ হচ্ছে শহরমুখী। এই নাগরিকতার সূত্রপাত স্বাধীনতা ও দেশভাগের সমকালে। উদ্বাস্তু সমস্যা, শরণার্থী প্রবেশ, জন্মনিয়ন্ত্রণে সচেতনতার অভাব ইত্যাদি কারণে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই গেছে। ফলে প্রতিযোগিতা বেড়েছে, বেড়েছে বেকার সমস্যা। প্রশাসনিক অদক্ষতার জন্য সরকারি অফিসে কাজের সুযোগ কমেছে। বাধ্য হয়েই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কর্পোরেট চাকরির দিকে ঝুঁকেছে। কর্পোরেট জীবনে বেড়েছে কাজের প্রেসার, বেড়েছে ব্যস্ততা। পাশাপাশি রয়েছে পদোন্নতির চিন্তা, ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা। শ্রমের দাবী উঠেছে পণ্যের খাতায়। বাজার অর্থনীতির চাপে উত্তরোত্তর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তার জের চলছে আজও। সংসার চালাতে নাজেহাল অবস্থা সাধারণ মানুষের। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে আয়ের তুলনায় বেড়েছে ব্যয়। অন্যদিকে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে নিউক্লিয়ার-ফ্যামিলির উদ্ভব হচ্ছে নিরন্তর। মানুষের মনের জগতে এসেছে অযাচিত সংকীর্ণতা। কেবলমাত্র নিজের স্ত্রী-সন্তানাদির দায়িত্ব নিতে গিয়েই হাঁপিয়ে উঠছে পারিবারিক পুরুষ-প্রধান। বিশ শতকের শেষে নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। শিক্ষিতা নারীর স্বাধীনতাকে সমাজ আলাদাভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। কাজের দুনিয়াতেও মেয়েরা পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। ছোট্ট ফ্ল্যাটবাড়ির ক্ষুদ্র কুঠুরিতে আঁটকে পড়েছে নাগরিক মানসিকতা। ভাবনা-চিন্তায় এসেছে সুক্ষ্মতা, জটিলতা; কমছে দূরদৃষ্টি। প্রয়োজনের তাগিদে ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রলোভনে স্বামী-স্ত্রী সন্তানের দায়িত্ব একে অন্যের ওপর চাপিয়ে মুক্ত হতে চাইছে। মানসিক পায়চারির পথে পিতা-মাতার সান্নিধ্য থেকে তাদের সন্তান বঞ্চিত হচ্ছে। শিশুমনে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। খালিচোখে তা প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব হলেও সমাজ ও পরিবারের ওপর পরোক্ষে নিয়ামকের ভূমিকা নিচ্ছে। তাই সন্তান যখন নিজে পিতা-মাতার ভূমিকায় আসছে অবিকল একই ঘটনা ঘটছে। বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের স্নেহের সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে অঙ্কুরেই। ফলে পারিবারিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় লক্ষ করা যাচ্ছে সাম্প্রতিক কালে। দিব্যেন্দু পালিতের 'মুখগুলি' গল্পটি একচোখা। সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্যের অভাব, দায়সারা মনোভাবকেই তিনি প্রধান করে তুলেছেন দিবাকর ও তার চার ভাইবোনের মাধ্যমে। পিতা-মাতার ভ্রান্ত জীবনবোধের কথা এখানে আসেনি। সুধার মধ্যে সন্তানদের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা ও আকর্ষণের কোনো অভাব নেই। গল্পটি পিতা-মাতার দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখা। আমরা গল্পটি বিশ্লেষণ করে গল্পকার দিব্যেন্দু পালিতের বিশেষ একটি প্রবণতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করবো।

আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার রাভা জনজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর : একটি পর্যালোচনা

উত্তম সরকার

RKDF UNIVERSITY, RANCHI

নদী পাহাড় অরণ্য আধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গের উত্তর সীমান্তের আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় উপনিবেশ উত্তর সময় থেকে বহু ভাষাভাষী এবং জনজাতির বাস। এই অঞ্চলে বাসবাস কারি উপজাতি সম্প্রদায় গুলি হল - রাভা, টোটো, মেচ, লেপচা, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা প্রভৃতি। এদের মধ্যে রাভা উপজাতি একটি অন্যতম জনগোষ্ঠী। এরা পূর্ব ভারতের বৃহত্তর কিরাত (Indi-Mongoloid)জনজাতির একটি শাখা। বর্তমানে এরা পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আসামের ধুবরি, কোকরাঝার্, গোয়ালপাড়া এবং মেঘালয়ের পশ্চিম গারো পাহাড় জেলায় অধিক পরিমানে বাস করেন। আলোচ্য আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় এরা প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী। এরা মূলত পাঁচটি জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত –কোচ, রংদানিয়া, পাতি, দাহরিয়া, ও মায়াতোরী। রাভাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সামাজিক ঐতিহ্য রয়েছে। এই উপজাতি মুলত মাতৃ প্রধান। তবে পারিপার্শ্বিক ভারতীয় সমাজের প্রভাবে তাদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যাবস্থাতে রুপান্তর ঘটেছে। বর্তমানে রাভা সমাজে প্রভুত পরিবর্তন এসেছে। মূলত বৈবাহিক ও পেশাগত বিষয়ে। রাভাদের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলও যথেষ্ঠ আকর্ষণীয়। এদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নাচ গান বেশ সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়। এছাড়া পুজা পার্বণ, ফসল কাটার উৎসব, বিবাহ অনুষ্ঠান চমৎকারিত্বের দাবী রাখে। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের জীবন ধারণও পালটায়। বর্তমানে মিলে প্রস্তুত ও রেডিমেড পোশাক সহজ লভ্য হওয়ায় রাভা রমণীদের বস্ত্রবয়ণ বর্তমানে অতীতের স্মৃতি। রাভারা প্রথম দিকে অনেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলেও অনেকে খ্রিষ্টান ধর্মও গ্রহন করে। তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমানে বিশ্বায়নের ফলে এবং নাগরিক সভ্যতার প্রভাবে তাদের নিজস্ব কিছু ঐতিহ্য হারিয়েছে। বর্তমানে তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক নতুন মূল্যবোধের প্রসার ঘটেছে।

শতভিষা : বাংলা কাব্যজগতের একটি উত্তরণ

ঋদ্ধি পান

গবেষক, বাংলা বিভাগ, ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪৭ এর পরবর্তী সময়ে প্রাতিষ্ঠানিকতা কোথাও গিয়ে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে দিতে চাইছিল। সাহিত্যের সত্য প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছিল। তাই লিটিল ম্যাগাজিনের প্রচলন শুরু হয়। সময়ের ধারাবাহিকতায় এই ক্ষুদ্র প্রক্রিয়ায় চালু লিটিল ম্যাগাজিন ক্রমে ক্রমে বড়ো নামকরা সাহিত্য পত্রিকায় পরিণত হতে শুরু করে। 'শতভিষা' তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। 'শতভিষা' শুরু করেছিলেন আলোক সরকার এবং দীপঙ্কর দাশগুপ্ত। পূর্ববর্তী যে সমস্ত পত্রিকাগুলি 'শতভিষা'র আগে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন 'কবিতা' পত্রিকা তাদের প্রয়াস কাব্যজগতে নতুন বাঁক এনে দিলেও শতভিষা পত্রিকা (১৯৫১) বাংলা কাব্যজগতকে কবিতার এক নতুন পথ দেখায়, তার উদ্দেশ্য তার তারুণ্য ছিল তার সময়ের অন্যান্য পত্রিকার থেকে যেমন আলাদা তেমনি নানা উত্তরসূরী পত্রিকার জন্মদাতাও। শতভিষা'য় খোঁজা হচ্ছিল "কবিতার এক শুদ্ধ স্বত্তা।" সম্পাদক আলোক সরকার লিখেছেন, 'শতভিষা' তরুণ কবিদের মুখপত্র নয়; প্রবীণ কবিদের মুখপত্র নয়, কবিতার ব্যাপারে বয়স বিচার হাস্যকর; 'শতভিষা' কবিতারই মুখপত্র, যে কবিতা পূরাতনের পূনরাবৃত্তি করে না, ফ্যাশনের দাসত্ব করে না, হুজুগে মাতে না, যে কবিতা ব্যাক্তিত্ব চিহ্নিত, একই সঙ্গে সৌন্দর্যময় অপূর্ব এবং অ-পূর্ব বস্তু নির্মাণ ক্ষমতার প্রজ্ঞা প্রমাণ করতে সক্ষম। শতভিষা আগাগোড়া শুধু কবিতার জন্যই যেন নিবেদিত একটি পত্রিকা। দীর্ঘ সময় ধরে পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য যারা পাশে ছিলেন তারা কেউ ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক কবি কেউ ছিলেন তরুণ কবি। এইভাবে দুইয়ের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন সেখানে ছিল। পঞ্চাশের কবিতা যেন একটি বিস্তার। বাংলা কাব্যজগতে এইসময় নানান পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে এক বিপুল পাঠকসমাজও গড়ে ওঠে। তরুণতম কবিতা নিয়ে যেমন – 'কৃত্তিবাস'এর তরুণ কবিরা সেখানে এক স্পর্ধা দেখিয়েছেন, প্রবীণদের লেখা সেখানে প্রায় গ্রহণ করাই হয়নি। তেমনি 'শতভিষা'য় ছিল "শিকড় অভিলাষী চৈতন্যের কবিতা।" 'শতভিষা'য় যারা লিখতেন তাদের রচনার সমালোচনাও 'শতভিষা'র একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অরুণকুমার সরকারের 'দূরের আকাশ', নরেশ গুহ, তারাপদ রায়, মনোরঞ্জন রায়ের কবিতা এবং আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর 'যৌবনবাউল' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা রয়েছে। কবিতা সম্পর্কে, কবিতা কেমন হতে পারে ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়েও 'শতভিষা'র বিভিন্ন সংকলনে আলোচিত হয়েছে। শতভিষায় যারা নিয়মিত লিখতেন তারা ৫ এর দশকে যে লেখা লিখেছেন ৬ বা ৭ এর দশকে তাঁদেরই লেখার অনেক উত্তরণ ঘটেছে কিন্তু লক্ষনীয়, শতভিষা পত্রিকার উদ্দেশ্য কবিতার যে স্থির নিমগ্নতার প্রকাশের গুরুত্ব, শুদ্ধ কবিতার চর্চা বার বার উল্লেখ করা হয়েছিল সম্পাদকের লেখনীতে তার মর্যাদা এতটুকু কোথাও গিয়ে ক্ষুন্ন হয়নি। জোর করে কোনো আন্দোলনের মুখপত্র শতভিষাকে হয়ে উঠতে হয়নি অথবা সে দায় তার ছিলই না। অনেকাংশে কবিতার ভিতরকার সত্যি প্রকাশের দায় ছিল।

ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী কবি জীবনানন্দ দাশ ও তাঁর কবিতা

ড. কাজী সাকেরুল হক (W.B.E.S.)

সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মোহনপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্যজগতে এক নতুন ধারার স্রষ্টা কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কবিত্বের প্রকাশ কাব্যজগতের পুরো অবয়বটাই বদলে দিয়েছিল। তাঁর কবিতায় দেশজ বাকরীতির সঙ্গে এসে মিশেছে তাঁর সংবেদনশীল মনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির আশ্চর্য উচ্চারণ, জীবনকে দেখার অনুভূতিশীল জীবনদৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে তিনিই রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে নিজেকে এমনভাবে তিনি আত্মনিয়োজিত রেখেছিলেন যে, জীবন ও কবিতা এই দু-ইকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। একটা গোটা মানুষকে ফুটিয়ে তুলতেই তাঁর কবিতার পদচারণা। এই কাজে তিনি মানুষের ব্যক্তিগত সফলতা-অসফলতা, সমগ্র মানবের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রূপ দিতে চেয়েছেন, ফলে ভালো-মন্দ, আশা-নিরাশা, আলো-অন্ধকার, রণরক্ত-সফলতা- এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ভাষাকে কাব্যিক রূপ প্রদান করতে চেয়েছিলেন।

জীবনানন্দ দাশের আবির্ভাব লগ্ন শুধু বাংলায় নয়, ভারতে কিংবা সারা বিশ্বে ক্রান্তিলগ্ন; দুই মহাযুদ্ধের ভয়ংকর প্রভাব মানবজীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয় সূচিত করেছে। 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ', 'সকলেই সকলকে আড় চোখে দেখে'। এই হেন পরিস্থিতিতে সংবেদনশীল কবিসত্তা শুধুই প্রকৃতি-প্রেমকে নিয়ে রোমান্টিকতার স্বপ্নজাল বুনতে থাকবেন- এটা জীবনানন্দের ক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। তাই তো দেখা যায়, তাঁর কবিতায় চল্লিশের দশকের নগরজীবনের রক্তাক্ত পটভূমিকা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, মারী-মন্বন্তর প্রভৃতিতে নিদারুণ মর্মাহত কবির নির্মোক বিশ্লেষণ। আমাদের আলোচ্য 'ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী কবি জীবনানন্দ দাশ ও তাঁর কবিতা' শীর্ষক নিবন্ধে দেখাতে চেয়েছি সেই যুগযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট কবি প্রাণের বেদনামথিত হৃদয়ের হাহাকার ও তার থেকে মানবতায় উত্তোরণের প্রয়াস কীভাবে কোন্ কোন্ কবিতায় তা প্রতিফলিত করে দেখিয়েছেন।

এই নিবন্ধের উপরোক্ত বিষয়টিকে আলোচনায় স্পষ্টতর করতে গিয়ে 'জীবনানন্দ দাশের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতা সমগ্র' ও 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থ দু'টির বেশ কয়েকটি কবিতাকে উদ্ধৃত করেছি। বিশেষ করে তাঁর 'হিন্দু-মুসলমান', 'বিভিন্ন কোরাস', 'রাত্রির কোরাস', 'সুচেতনা', 'রিস্টওয়াচ', 'আবহমান', 'মৃত্যু-স্বপ্ন-সংকল্প', '১৯৪৬-৪৭', 'কয়েকটি লাইন' প্রভৃতি কবিতার কিছু কিছু ছত্র উদ্ধৃত করে তাঁর কবিমানসিকতার উদার অসাম্প্রদায়িক মানবিক রূপটিকে বক্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। আলোচনার শেষের দিকে বর্তমান যুগ-পরিবেশ-পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে এটাই বলতে চেয়েছি, আজও সমান প্রাসঙ্গিক জীবনানন্দের কবিতার বিষয়-ভাবনা।

আনিসুজ্জামানের *আমার একাত্তর* : একটি পর্যালোচনা

ড. কৃষ্ণপ্রসাদ চ্যাটার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ ধর্মার্থ ফাউন্ডেশন বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচী, ঝাড়খণ্ড, ইণ্ডিয়া

বাংলাদেশের একজন মননশীল গবেষক আনিসুজ্জামান। তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দীর্ঘ সময় অধ্যাপনা করেছেন। এবং অধ্যাপনার সূত্রে নানা স্থানে ভ্রমণ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি নানা সময়ের নানা ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ সময়ের নানা ঘটনা তিনি যত্নের সঙ্গে অবলোকন করেছেন। এবং তা লিখেও রেখেছেন। আমরা সেই ঘটনাগুলির পরিচয় পাব তাঁর লেখা *আমার একাত্তর* আত্মজীবনী পাঠ করলে। যাতে দেশ কাল সাহিত্যের নানা আলেখ্য অত্যন্ত বাস্তবভাবে ফুটে উঠেছে। তাই আনিসুজ্জামানের লেখা *আমার একাত্তর* বই স্বতন্ত্র অভিনিবেশ দাবি করে। এজন্য বর্তমান প্রসঙ্গে আানিসুজ্জামানের *আমার একাত্তর* আত্মজীবনীকেই আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে *আমার একাত্তর* বইয়ের একটি পর্যালোচনা করাই বর্তমান আলোচনার মূল লক্ষ্য।

বর্তমান প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামানের *আমার একাত্তর* বইয়ের আলোচনা ধাপে ধাপে করা হয়েছে।

বিজন ভট্টাচার্যের ‘দেবীগর্জন’ নাটকের লৌকিক উপাদান

কৃষ্ণময় দাস
গবেষক বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

দুটি মহাযুদ্ধে ভেঙে পড়া অর্থনীতির মন্দাতে মধ্যবিত্ত জীবনে পুরনো মূল্যবোধগুলি ক্রমশ ভেঙে পড়লে অত্যাচার, শোষণ, দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর করাল ছায়া চারদিকে দেখা দেয়, বাস্তব রূপ নগ্নভাবে ধরা দেয় বাংলা নাট্যমঞ্চে। শুরু হয় বাস্তববাদী জীবনকে নিয়ে নাটক রচনা যার প্রধান দর্শক হবে শ্রমিক, কৃষক, মজুর, সর্বহারা সাধারণ মানুষ; তুলে ধরা হবে জীবনের সমস্যা সংগ্রাম এবং মুক্তির উপায়। স্বীকৃতি পাবে ব্যক্তিত্ব এবং গোষ্ঠী। নিপীড়িত মানুষদের করা হলো নাটকের পাত্র পাত্রী যাতে সহজেই নাটকটি সর্বহারা মানুষদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে কাজ করেছেন, তাই সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতি, বিশ্বাস, সংস্কার, সংস্কৃতির সাথে খুব ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি তার জীবনের অভিজ্ঞতাকে শিল্পে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। দেবীগর্জন নাটকটি তার

প্রত্যক্ষ প্রমাণ। একদিকে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের সৃষ্ট পুঁজিবাদী সম্প্রদায়ের অত্যাচার, সেই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম এবং সংগ্রামী মানুষগুলোর প্রতিদিনের জীবন ছবি ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। আদিবাসী তথা কৌমসমাজকে কেন্দ্র করে এই নাটকটি গড়ে উঠেছে। কৌমসমাজের নিখুঁত ছবি এই নাটকটির একটি বিশেষত্ব। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য দেবীগর্জন নাটকে কৌমসমাজের রীতি-নীতি, লোকাচার, লোকশিল্প, লোকউৎসব যে পরিচয় রেখেছেন সেগুলো আলোচনা করবো কৌমসমাজের ভাষার একটি নিজস্ব ধরন রয়েছে, এছাড়া প্রচলিত ছড়া, প্রবাদ, গান - এইসব নিয়েই আমার প্রবন্ধ।

মধুসূদন দত্ত-র নাটকের সংলাপ : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

ড. কৌশিককুমার দত্ত

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গভর্ণমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ মঙ্গলকোট, পূর্ব বর্ধমান

বাংলা নাটকে সংলাপের আদর্শ ভাষারীতি কী হবে তাই নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন নাটককার মধুসূদন দত্ত। সাধুঘেঁষা চলিতরীতি থেকে ক্রমে অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ, আবার সেখান থেকে সরে এসে কথ্যচলিতের সাবলীল ব্যবহারে মধুসূদনের নাটকগুলি দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মধুসূদনের এই সংলাপ-নিরীক্ষা বাংলা নাটকের সংলাপের বিবর্তনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছিল। পরবর্তীকালে অমিত্রাক্ষরের ভিতের উপরই গড়ে উঠেছিল গৈরিশ ছন্দ। সময়কাল ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কথ্যচলিতেরও নানা বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ ঘটিয়েছেন নাটককার মধুসূদন। তাঁর প্রহসন দুটিতে সমাজভাষার বিপুল বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন সামাজিক ভাষার কোডের (Code) সফল ব্যবহার বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দিকচিহ্ন স্থাপন করেছে। পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু প্রমুখ বিখ্যাত নাটককারগণ মধুসূদনের প্রহসনের ভাষারীতি অনুসরণ করেছেন। প্রসঙ্গত মধুসূদনের নাটকের সংলাপের ভাষাগত বৈচিত্র্য ও বিবর্তনের রূপরেখাটি সংক্ষেপে বুঝে নেওয়াই আমাদের প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘গাছটা বলেছিল’ গল্পে ইকোক্রিটিসিজমের ভাবনা

গনেশ কর্মকার

গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠা মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে। তাই তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে জড়িয়ে আছে প্রকৃতি, দেশের মাটি ও মানুষের কথা। তাঁর গ্রামের কাছেই ছিল দ্বারকা নদীর আববাহিকা অঞ্চল, কাশ কুশ ব্যানার জঙ্গল রাখালিয়া জীবন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল প্রবল ভাবে। প্রকৃতির মধ্যে জৈবিক সত্তা উপলব্ধি করেছেন। এই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ‘গাছটা বলেছিল’ ছোটো গল্পে। এই গল্পের মধ্যে রয়েছে গাছ ও মানুষের অস্তিত্ব। গল্পে বলা হয়েছে “গাছেরা কথা বলে। গাছেরা বাতাস থেকে ভাষা শেখে।... কোনও কোনও গাছও মানুষের ভাষা শেখে”। এবং এই গাছটি মানুষের ভাষায় কথা বলে। তার কথা সবাই শুনতে পায়না যে শুনতে পাই গাছটি তাকে ‘মর মর মর’ বলে,সেই মরে যাই। তেমনি গল্পের বুড়িও গিয়েছিল গাছটার তলায় তারও শেষ পরিণতি হয়েছিল মৃত্যু। একে একে যেই গাছের কাছে গিয়েছে তারই কোনো না কোনো কারনে মৃত্যু হয়েছে। এমন কি যারা গাছটার প্রাণ থাকার কথা অস্বীকার করে গাছটিকে কেটে ফেলতে চেয়েছিল তারাও মারা মারি করে মরেছে।

মুসলমান বাঙালির মাতৃভাষা সংকট : প্রসঙ্গ সওগাত পত্রিকা

গীতশ্রী সরকার

গবেষক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

উনিশ শতকের সময়পর্বে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নব জোয়ারের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল তাতে বাঙালি জাতির দুই স্তম্ভ, হিন্দু এবং মুসলমান একযোগে স্নাত হতে পারেনি। উনিশ শতকের প্রাথমিক পর্বে মুসলমান বাঙালি সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ সংস্কার, শিক্ষাগ্রহণ, কর্মক্ষেত্র সবদিক থেকেই মুসলমান সমাজ সাময়িক ভাবে পশ্চাৎপদ ছিল। নবাবি আমলের পতনের পরবর্তী সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে ব্যাপক পালাবদল ঘটেছিল তার সঙ্গে মুসলমান বাঙালি প্রাথমিক পর্বে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। নব্য শহরে অর্থনীতির পত্তন, নব্য জমিদারি প্রথার উদ্ভবের ক্ষেত্রে যে মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণীর প্রাদুর্ভাব ঘটে তাতে হিন্দু বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতার তথ্যই পাওয়া যায়। এই নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধুনিক

শিক্ষা ক্ষেত্রে পদার্পণ করে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পশ্চাৎপদতার কারণে ইংরেজ প্রচলিত আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে সরেছিল মুসলমান বাঙালি। মুসলমান বাঙালির এইসময় কতকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে বাধ্য হয়। তৎকালীন নানা পরিস্থিতির ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু একাধিপত্য স্থাপিত হয় 'বাঙালি' পরিচিত সত্তার ওপরে। এই আত্মপরিচয় অনুসন্ধান এর একটি অন্যতম অংশ মুসলমান বাঙালির মাতৃভাষা নির্বাচন। অবিমিশ্র মুসলমান সমাজের মাতৃভাষা, সংস্কৃতি নির্বাচন প্রসঙ্গে দ্বৈরথ ছিল। নিম্নবর্গীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান বাঙালি যখন বাঙালি সংস্কৃতি এবং ভাষার পরিচিত বৃত্তে আবর্তিত হয়েছে, তখন অভিজাত শরীয়ত বিশ্বাসে মুসলমান বাঙালি সংস্কৃতির অনুসন্ধান করেছে ফারসি বা উর্দুতে। এই সময় মুসলমান সমাজের সমাজসংস্কারকদের হাত ধরে গোঁড়ামি মুক্ত আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে মনোনিবেশ করেন আধুনিক মুসলমান বাঙালি।

নবাবী আমল হোক বা ইংরেজ আমল শাসকের ভাষা এবং সংস্কৃতি শেখার কাজেই হিন্দু বাঙালি সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। উনিশ শতকে বাংলা ভাষা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে হিন্দু বাঙালির যে ভূমিকা পালন করেছিল, সাময়িক পশ্চাৎপদতার কারণে আধুনিক বাংলা সাহিত্য নির্মাণ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এই সময় শিক্ষাগ্রহণের কাজে মুসলমান বাঙালি অগ্রসর হলে মাতৃভাষা সংক্রান্ত বেশ কিছু জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। এই সময় একদিকে যখন মুসলমান সমাজ তার মাতৃভাষা নির্বাচন প্রসঙ্গে দ্বন্দ্বে ভুগেছে, তখন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের হাত ধরে যে সংস্কৃতগন্ধী বাংলা ভাষা চর্চা শুরু হয় মুসলমান বাঙালিকে খানিক বিরূপ মনোভাব পণ্য করে তুলেছিল।

আধুনিক সমাজ সাহিত্য সংগঠন থেকে ধর্মীয় প্রচার, রাজনৈতিক মতাদর্শের গঠন থেকে সমাজ সংস্কার মূলক প্রচার সবক্ষেত্রেই উনিশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সংবাদ সাময়িক পত্র। সংবাদ সাময়িকপত্র প্রচারণার ক্ষেত্রেও পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে এমন বাঙালি পরিচালিত সাময়িক পত্র পত্রিকার পথচলা শুরু হয়। আধুনিক সাহিত্য সংগঠন এই সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক পত্র সওগাত। সওগাত পরিচালনায় সপ্তনীতির অন্যতম ছিল আধুনিক সাহিত্য সংগঠন, আধুনিক লেখক গোষ্ঠীর নির্মাণ। সওগাতে আলোচিত নির্বাচিত প্রবন্ধের মাধ্যমে তৎকালীন মুসলমান সমাজের মাতৃভাষা সংক্রান্ত সমস্যা, মুসলমান বাঙালির এই সংক্রান্ত মতামতগুলি আলোচনার চেষ্টা করব।

সমাজ-দর্শন-ধর্ম-সংস্কৃতি এবং সাহিত্যক্ষেত্রে অদ্বিতীয় যুগনায়ক: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ড. গীতিকা পণ্ডা
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং বাংলা বিভাগীয় প্রধান
সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম, ৭২১৫০৬

এক বিশাল ব্যাপ্তি, বিপুল সম্ভাবনার বিস্তার— তাকে সংক্ষেপে ধরা সে বড় দুষ্কর্ম। এক আশ্চর্য মানব। শুরুটা একেবারে সাদামাটা। ক্রমশঃ ছড়িয়ে যেতে থাকে অযূত জ্যোতি, কর্ম, ধর্ম, জীবন, দর্শনের সম্মিলিত জ্যোতিপুঞ্জ। বাক্য নয় বোধ, জ্ঞান নয় আচরণ, রতি নয় আরতি— এই নিয়েই তাঁর স্থিতি-অস্থিতি, চৈতন্যপ্রাপ্তি, চৈতন্য জাগৃতি। তিনি মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় আঙ্গিকভাবনা

ড. গুরুপদ অধিকারী
সহকারী অধ্যাপক, মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা বলতে বিশ শতকের তিন, চার বা পাঁচের দশকে প্রধানত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তীর হাত ধরে যেসব কবিতার বিস্তার ঘটেছিল, প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে যেগুলি বাংলা কবিতাকে একটা বিশিষ্ট রূপদান করেছিল আমরা এই পর্বের বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইছি। এইসমস্ত কবিরা বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবিগোষ্ঠীর প্রেরণায় সেই সুদূরপ্রসারী জগতকে তাঁরা বাংলা কবিতার সম্পদ করে তুলেছেন। 'বনলতা সেন' কবিতায়, জীবনানন্দ দাশ লিখলেন,'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'। এর ফলে বাংলা কবিতায় কালচেতনা অন্য এক মাত্রা পেল। ইতিহাসের পথ ধরে বাংলা কবিতার ব্যাপ্তি ঘটে গেল। এই প্রসারতা কেবল content এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, form বা আঙ্গিকের মধ্যেও ঘটেছে পালাবদল। বোদল্যেয়র থেকে শুরু করে স্তেফান্ মালার্মে, রিল্‌কে, এলিয়ট্, ইয়েট্‌সের মতো পাশ্চাত্য কবিরা রবীন্দ্রোত্তর কবিদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছেন। তাদের কবিতায় শব্দ বা প্রতীকধর্মের প্রয়োগ, কবিতার বিন্যাস বা অবয়ব এই পর্বের বাংলা আধুনিক কবিতাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁরা দেশজ রীতি ও পাশ্চাত্যরীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। ছন্দের ক্ষেত্রে এসেছে বৈচিত্র্য, আধুনিক বাংলা কবিতাকে যা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এর ফলে ছন্দোবিন্যাসে, শব্দ নির্বাচনে, বাক্যগঠনে, অলংকার চয়নে আধুনিক কবিতায় শৈলীগত নানা বৈচিত্র্য দেখা গেছে। 'কবিতায় আঙ্গিকভাবনা : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা'— শিরোনামে আমরা এই আলোচনায় আঙ্গিক ভাবনার নানাদিক তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি।

মৌসুনী দ্বীপের ইতিকথা : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

গুরুপদ দাস
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯২০ এর দশকে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জঙ্গল সাফাই করে বসবাসের উপযোগী করে তুলেছিল সুন্দরবনের ফ্রেজারগঞ্জ ও গঙ্গাসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত মৌসুমী দ্বীপকে। দ্বীপটি সুন্দরবনের মানুস্য বসবাস সমৃদ্ধ ৫৪ নম্বর দ্বীপের মধ্যে একটি আলোচিত দ্বীপ। দ্বীপটিতে বসবাসের জন্য জন-মানুষএসেছিলেন ময়ূরভঞ্জ (উড়িষ্যা), মেদিনীপুর ও ডায়মন্ড হারবার (পশ্চিমবঙ্গ) অঞ্চলগুলি থেকে। ব্রিটিশ সরকার দ্বীপটিতে জাহাজের দিকনির্দেশনের জন্য বানিয়েছিলেন দুটি দিশারু (উত্তরে পয়লাঘেরী ও দক্ষিণে সল্টঘেরীতে), লবণ উৎপাদনের জন্য তৈরি করেছিলেন একটি লবণ কারখানা (দক্ষিণেসল্টঘেরী), তাঁদের থাকার জন্য বানিয়েছিলেন একটি খাসমহল অফিস (বাগডাঙ্গা), শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিদ্যালয় (১৯৩৭), এবং খাবার জলের জন্য খনন করেছিলেন দুটোপুষ্করিণী। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আরও একটি বিদ্যালয়(১৯৬৫), একটি গ্রামীন হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী ক্ষয় কার্যের দরুন দ্বীপটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর আকার ধারণ করেছে যার জন্য বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। এই আলোচ্য প্রবন্ধে ১৯২০ এর দশক থেকে ২০২০ এর প্রারম্ভিক সময়কাল পর্যন্ত প্রায় ১০০ বছরে মৌসুনীতে বসবাসের কাহিনী, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জমি বিলি ব্যবস্থা, লবণ কারখানা, দিশারু, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা পরবর্তীকালের গ্রামীণ হাসপাতালসহ মৌসুনী দ্বীপের আয়তন হ্রাসের বিষয় সমূহকে ইতিহাসআঙ্গিকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিনোদিনী : এক নটী ও সাহিত্যিকের জীবন ও সৃষ্টি

ড. গোবিন্দ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজ

বিনোদিনী কেবল অভিনেত্রী নয়, একজন সাহিত্যিকও বটে। ছোটবেলায় গঙ্গাবাঈয়ের হাত ধরে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে বিনোদিনী। গায়িকা থেকে সে অচিরে হয়ে ওঠে অভিনেত্রী। জনপ্রিয় হয় নটী বিনোদিনী নামে। অসাধারণ অভিনয়ের গুনে দর্শকের মনোরঞ্জন করে তাদের প্রশংসা যেমন পেয়েছে সে তেমনি ধন্য হয়েছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ করে। কিন্তু অভিনয় জীবনের মধ্য গগনে অনেক অভিমান বঞ্চনা নিয়ে নাট্য-জগৎ থেকে সে বিদায় গ্রহণ করে। তারপর সংসার-জীবনের নানা সুখদুঃখের পাশাপাশি সাহিত্য-সাধনাকে করে নিয়েছিল সে তার জীবন-সঙ্গী। অভিনেত্রী এবং সাহিত্যিক উভয়ে মিলেই বিনোদিনীর প্রতিভার মূল্যায়ন আবশ্যিক। সেই প্রচেষ্টা বর্তমান নিবন্ধে।

সময়ের অমেয় *আঁধারে* উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের 'অন্যভুবন' নাটক : একটি সমীক্ষা

গোলক পতি ধল

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

নাটকের প্রতি আমার গভীর তৃষ্ণা অভিনয়ের পথ ধরে। আর অভিনয়ের সূত্রেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় নাটকের প্রতি। বিস্মৃত হই কমেডির ধাঁচে তাঁর নাটকে কিভাবে ব্যঞ্জিত হয় সামাজিক দায়বদ্ধতা। নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ যোগ্য পূর্ণাঙ্গ নাটক 'অন্যভুবন'। তিনি কলকাতার একটি পুরানো বাড়ির পারিবারিক কলাহকে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনী বর্ণিত। আজকের দিনে পারিবারিক কলহ একটা অতি সাধারণ ব্যাপার হলেও নাট্যকার এই সাধারণ ঘটনাকে বাস্তব জীবনের এক অসাধারণ রোমাঞ্চকর কাহিনী দর্শক মন্ডলের কাছে পরিবেশন করেছেন। নাট্যকার নাটকের চরিত্র চিত্রনে একদম বাস্তব সমাজের চরিত্রগুলিকে তুলে এনেছেন। এই নাটকে কল্যাণ চরিত্রটি যেন আমাদের সমাজের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তা এবং যার মধ্যে এখনো আত্মগরিমা এই বৃদ্ধ বয়সেও সমপরিমাণে বর্তমান। তাই কল্যাণ এক প্রকার মনের কষ্ট নিয়ে বলে ---

"কল্যাণ।। বৃদ্ধদের কথা কেউ মনে রাখে না রে দিদিভাই। না পরিবার, না গভর্নমেন্ট। তার উপর লাইফসেভিং ড্রাগের কল্যাণে মরণও দূর অস্ত"। [পৃ- ১১৬]

প্রতিযোগিতার চাপে মানুষ লড়ছে রিয়্যালিটি-শো-এর মঞ্চে, তার সঙ্গে নকল হয়ে উঠছে আসল। মূল্যবোধ যাচ্ছে হারিয়ে। চলতশক্তিহীন বৃদ্ধ পিতা ও তার পুত্র-পুত্রবধূদের নানান টানাপোড়নে নাটকের সূত্রপাত হয়। ঝগড়া-এর জন্য বিখ্যাত এই বাড়ি। এখন যদি কলহ নিয়ে রিয়্যালিটি-শো-এর প্রতিযোগিতা হয়? কে কেমন ঝগড়া করে?কে জেতে?কে হারে? টেলিভিশনে ঢুকে পড়ে এই বাড়িতে, শুরু হয় চুলোচুলির পাঁচালি। আবার আচমকা ফিরে আসে এই বাড়ির নিরুদ্দিষ্ট বড় ছেলে যে ছিল শুদ্ধতার প্রতীক। এই মানুষটি কি আসল? বৃদ্ধ খোঁজে এক অন্য ভুবন। স্বপ্নের ভুবন এই হারানো সন্তানের ভিতরে।

রবীন্দ্র-গল্পে নারীর ব্যক্তিসত্তার বিবর্তন

চন্দন বিশ্বাস

গবেষক, আর.কে.ডি.এফ ইউনিভার্সিটি, রাঁচি

(বর্তমানে ড. বি. আর. আম্বেদকর শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে SACT শিক্ষক রূপে কর্মরত)

প্রতীতিযোগ্য প্রত্যয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করি ভারতীয় সাহিত্য বলয়ে নারীর নিজস্ব মহিমা। বিবর্তিত ধারায় সময়ের প্রেক্ষণীপট পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রত্যক্ষ করি সমাজে নারী বঞ্চিত, অবহেলিত, অপমানিত। মনস্বী রবীন্দ্রনাথ নারীর প্রতি অবিচারের দৃশ্য অবলোকনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং তার ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সোচ্চার হয়েছেন প্রতিবাদে। বিশ্লেষণের ধারা পথে এ কথা সত্য হয়ে ওঠে রবীন্দ্র ছোটগল্পে পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রগুলি অনেক বেশি উজ্জ্বল, শক্তিশালী, তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যঞ্জনাময়। বাংলাদেশের জল আবহাওয়ায় লালিত নারীদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-মৌনতা-ব্যর্থতা একসময় পর্যবসিত হয়েছে সরব বা নীরব প্রতিবাদে। রবীন্দ্র ছোটগল্পে নারীর ব্যক্তিসত্তার এই যে বিবর্তন, আলোচ্য সন্দর্ভে আমরা তার সুলুক সন্ধানে ব্রতী হব।

লালসালু : প্রসঙ্গ ধর্মীয় অন্ধ বেড়াজাল ও জীবন-জীবিকা

চিত্ততোষ পৈড়া

সহকারী শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, এলাহিয়া হাই মাদ্রাসা (উ: মা:)

এলাহিগঞ্জ, হরিশপুর, কোতয়ালী, পশ্চিম মেদিনীপুর

'লালসালু' উপন্যাসে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র না করে সরাসরি গ্রামীণ জীবনের এক জটিল ও দ্বন্দ্বময় বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এই উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে মুসলিম অধ্যুষিত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কথা। যেখানকার মানুষজনেরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মভীরু ও দারিদ্র্যপীড়িত। এদেরকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির মানুষ রয়েছে— যারা শঠ, প্রতারক ও ধর্মব্যবসায়ী। লেখক এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যুগযুগ ব্যাপী চলতে থাকা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসকে দূর করে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী ভাবনার উদয় ঘটাতে চেয়েছেন, যা আমাদের আলোচনার বিষয়।

সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পে প্রেমধর্মের প্রকাশ

টিংকু কুমার ঘোড়াই

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গৌরব গুঁইন মেমোরিয়াল কলেজ, চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর

সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫) খণ্ডিত স্বাধীনতার হতাশা, দেশভাগ, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তথা নগরজীবনের সার্বিক রূপ তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।'কিনু গোয়ালার গলি', 'শ্রীচরণেষু মা'কে ইত্যাদি উপন্যাসের জন্য তিনি সমধিক খ্যাতিমান। সন্তোষকুমার নানা পত্র-পত্রিকায় শতাধিক গল্প লিখেছেন।। বস্তুতঃ সুখ বা প্রেমের মতো বিষয় অবলম্বন করে সন্তোষকুমার ঘোষের লেখা প্রেমধর্মী গল্পের সংখ্যাও খুব কম। সন্তোষকুমার ঘোষের প্রথম দিককার লেখায় তাঁর আবেগের প্রাধান্য ও রোমান্টিক মানসের ছাপ রয়েছে। পরে তাঁর লেখায় ধীরে ধীরে বস্তুজীবনের সমস্যা ও জটিলতা প্রাধান্য পেতে শুরু করে। তাঁর এই সময়ের গল্পে উচ্চ-মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজের অবক্ষয়ের চিত্রের পাশাপাশি গভীর জীবনবোধ, মানসিক সংকট, অন্তর্মুখীনতা, খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণা থেকে দার্শনিক ভাবনামূলক তত্ত্ব প্রবণতা ও মৃত্যুচেতনা প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। ক্রম পূর্ণায়মান জীবনবোধের কারণে সন্তোষকুমার ঘোষের শেষ পর্বের গল্পেও প্রেম ও প্রেমজ কিছু প্রসঙ্গ এসেছে। তাঁর কিছু প্রেমধর্মী ছোটগল্পের মধ্যে 'গিল্টি', 'যাদুঘর', 'হয় না', 'সে আমার প্রেম', 'প্রেমপত্র', 'সাধ', 'ঠাকুমার ঝুলি', 'ঘ্রাণ', 'যে কোনও', 'সমীকরণ', 'বিকেল বেলা', 'মনসিজা', 'শোক' ও 'শবানুগমন' প্রভৃতি অন্যতম।সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পাবলীতে বিধৃত স্বাধীনোত্তর কালেরস্বপ্নাহত নগরবাসীদের গ্লানি, নারীদের দুর্বিষহ অবস্থা, ব্যর্থ দগ্ধ যৌবন, অবিশ্বাস, আত্মগ্লানি, আত্মছলনা আসলে সর্বতোভাবে বিকৃত, বিস্রস্ত না পাওয়া প্রেমের মুখোশে – প্রেমসুধাকেই আশা করে গেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার বিলুপ্তপ্রায় লোকগীতি কাহিনীগান

টুকটুকি হালদার

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর-৭২১১০২

পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

লোকসংস্কৃতির পরিভাষায় 'কাহিনীগান' অনেকের কাছেই অচেনা একটি শব্দ। মুর্শিদাবাদ জেলা ব্যতীত এইগানের প্রচলন কোথাও আছে বলে কখনো শুনিনি বা কোনো গ্রন্থ-প্রবন্ধেও পড়িনি। এমনকি মুর্শিদাবাদ জেলার বেশিরভাগ মানুষ কাহিনীগান কী সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞ। দু-চারজন জেলার গবেষক শুধু এই গানের নামমাত্রই করেছেন, তবে কাহিনীগানের বিস্তৃত আলোচনা বা কাহিনীগানের কোনো কাহিনী বা গানের নমুনা আজ পর্যন্ত কোন গবেষকই তুলে ধরেননি, অন্তত আমার চোখে দৃষ্ট হয়নি। তার অন্যতম কারণ, বিগত দুই-তিন দশকে কাহিনীগানের কোনো ওস্তাদ বা দোহারের ঠিকানা ভীষণ দুর্লভ। কোথাও বা দু-একজন কাহিনীকার চরম বার্ধক্যে বেঁচে আছেন। আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে কাহিনীগান সম্বন্ধে পূর্বে অনালোচিত বিভিন্ন দিক তুলে ধরার প্রয়াস করেছি, যেমন – কাহিনীগান কাকে বলে, কাহিনীগান কখন গাওয়া হয়, কাহিনীগান কেন গাওয়া হয়, কাহিনীগানের রমরমা কোন সময় ছিল, কাহিনীগানের লোকশিল্পীদের পরিচয়, কাহিনীগানে বর্ণিত গল্প-কথা ও গান, সর্বোপরি কাহিনীগান কেন লুপ্ত হয়ে গেল প্রভৃতি।

বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে লাঠিখেলা

ডঃ দয়াল চাঁদ সরদার

সহকারী অধ্যাপক ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয়

বাংলার নিজস্ব মার্শাল আর্ট লাঠিখেলা এই খেলার নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও ব্যাকরণ আছে। বাংলার গ্রামীণ সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাঠি খেলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বাংলার কথাসাহিত্যে ও সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লাঠি খেলা কিভাবে প্রাসঙ্গিক হয়েছে? তা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে লাঠিখেলা বীরত্ব ব্যঞ্জক ও আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়া হিসাবে কিভাবে তার অস্তিত্ব টিকে আছে সে প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে বাঁকুড়ার লোকশিল্প

দশরথ রজক

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সাহিত্য ও শিল্পের বয়স কয়েক হাজার বছর। প্রবাহমান সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সহস্র সহস্র শিল্পীর শিল্পময় জীবনের কিংবদন্তি ও শত শত জীবনের আখ্যান। মানব সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। রাজশক্তির উত্থান পতন হয়েছে। কালে কালে আর্য সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে প্রাচীন কুটির শিল্পগুলি হারিয়ে যাচ্ছে মানব সমাজ থেকে। সেই পল্লীবাংলায় আজ আর কামারের কামারশালেহাপারের শব্দ শোনা যায় না। ভ্রাম্যমান ডোকরা শিল্প যাচ্ছেহারিয়ে। হারিয়ে যাচ্ছে কাঠশিল্প, মৃৎশিল্প,পাটশিল্প ও তাঁতশিল্পের মতঅন্যান্য বহু শিল্প। লোকশিল্পের অবক্ষয় ও বিকৃতি ঘটেছে। জাতির সৃষ্টিমুখর সময়ের বিশেষ ক্ষণকে ধারণ করে রেখেছিল এগুলি। হতদরিদ্র, মধ্যবিত্তও বনেদি অভিজাত জমিদার যারা ঘরে-গেরস্থলীতে নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণরূপে শিল্পকে ব্যবহার করত, সেই অতীত যুগের শিল্পকলা একান্তই আজ স্মৃতি কথা। তবুওএ কথা বলতেই হয় শিল্প মানব জীবনকে এক অভাবনীয় স্বাচ্ছন্দ্যতা দিয়েছে। এনেছে নরনারীর মধ্যে শৌখিনতার বাতাবরণ। পরিবারে গৃহিণীদের মধ্যে এনেছে আতিথেয়তার মাধুর্যতা। তাই মানব জীবনে শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। এই উপলব্ধির একটা বড় অংশ অধিকার স্থাপন করে আছে সাহিত্যে। শিল্পীরা থেকে গেছেন সাহিত্যের মধ্যে। শিল্পীর শিল্পসত্ত্বা উজ্জ্বল হয়ে আছে সাহিত্যের পাতায় পাতায়। শিল্প যেমন সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। ঠিক তেমনি বহু সাহিত্যিক তাদের শৈল্পিক শক্তি দ্বারা শিল্পকে সৃষ্টি লোকে উত্তীর্ণ করেছেন। এখানেই শিল্প ও সাহিত্য বিশ্ব মানবের কাছে একে অপরে অঙ্গীকারবদ্ধ।

সাহিত্যের ভিন্নতর ক্ষেত্রে খ্যাত হয়েও প্রমথনাথ বিশীর নাট্যসাধনা

দিবাকর দাস

গবেষক

বাংলা নাট্য সাহিত্যে এমন কিছু নাট্য ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা সাহিত্যের অন্য ধারায় আপন খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিলেন কিন্তু,নাট্যশিল্পের অমোঘ টানে তাঁরা নাট্য রচনায় ব্রতী হন,প্রমথনাথ বিশী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আমরা জানি নাটক লেখার মূল উদ্দেশ্য মঞ্চ সফল করা। কিন্তু প্রমথনাথের নাটক সাহিত্য হিসাবেই বেশি আকর্ষণীয়।পাঠে আনন্দ দেয় বেশি। আমাদের এই আলোচনা তাঁর রচিত নাটকের গুরুত্ব

ও তাঁর নাট্যমানসিকতা। তাঁর সমালোচনা সাহিত্য ও নাটক সমগ্রের ভুমিকায় আমরা দেখি,আপাত তিনি বাংলা নাট্য ও বাঙালি বিদ্বেষী মনে হলেও কিন্তু বাস্তবে তা তিনি নন বরং পুরোদস্তর হিতৈষী। বাংলা নাট্যজগতে তিনি এক নতুন ধরণের নাট্য বিষয় ও নাট্য আঙ্গিকের আনয়ন করতে চেয়েছিলেন। হয়তো সম্পূর্ণ রূপে সফল হননি। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সাধুবাদ যোগ্য।তাই অখ্যাত নাট্য প্রতিভা হলেও নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস তাঁর কথা স্মরণ রাখবে।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যে পাশ্চাত্য পুরাণের আখ্যান

দিবাকর বর্মন

পি-এইচ.ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনানন্দের কাব্যে পাশ্চাত্যের পৌরাণিক আখ্যান আলোচনার সূত্রে আমাদের কাছে এসেছে গ্রিসের দেবী, ঈসিসের প্রসঙ্গ যিনি দয়ালু এবং মাতৃত্বের অধিকারী। তার সঙ্গে সিয়েরা লিওনের প্রসঙ্গ তাঁদের মাতৃভাষা ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশের মতোই বাংলা। মেম্ননন তার জীবনের অস্তিত্বকে চেতনায় জাগ্রত করেছেন জীবনানন্দ। তার মায়ের প্রার্থনার ফলস্বরূপ দেবতার স্তূপ মূলে স্থান পেয়েছে সে। প্রভাতে প্রথম সূর্য কিরণ এর সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীত ধ্বনির আখ্যানটি আমাদের মোহিত করে। এর পাশাপাশি এসেছে টাইটান ও ফিংস এর আখ্যান। ফিংস একটি বিশাল ডানাওয়ালা প্রাণী যার মাথা নারীর মত কিন্তু দেহটার সিংহের মত মিশরের এই অদ্ভুত মূর্তিটি বিভ্রাট ময় ধাঁধার প্রশ্ন করে মায়াজালে বেঁধে মানুষকে হত্যা করত তারি আখ্যান উঠে এসেছে 'মিশর' কবিতায়। সবশেষে উঠে এসেছে 'বেলা অবহেলা কালবেলা' কাব্যের 'পটভূমির' কবিতায় জ্যাসন ও ওডিসিয়ুস এর আখ্যান।

‘কৃষ্ণকুমারী’ : বাংলা নাট্যকলায় আধুনিকতার অনুক্রমনী

দীপক কুমার মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

উদয়নারায়ণপুর মাধবীলতা মহাবিদ্যালয়, হাওড়া – ৭১১২২৬

বেলগাছিয়ার পাইক পাড়ার সিংহ বাড়িতে অলীক কুনাট্য- ‘রত্নাবলী’র (১৮৫৮) দর্শনের পর বাংলা নাটক রচনায় মাইকেলের প্রথম হাতেখড়ি। ‘শর্মিষ্ঠা’ (১৮৫৯) দিয়ে শুভ সূচনা আর শেষের দিকের প্রহসন দু’টি বাদ দিলে তাঁর এই ধারার সফলতম এবং তাঁকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠাকারী অন্তিম নাটকই হল ‘কৃষষ্ণকুমারী’(১৮৬১)। যেখানে গঠনগত ও কৌশলগত দিক থেকে মধ্যযুগীয় কিংবা সংস্কৃত সাহিত্যাবেশের শিথিলতা পরিহারপূর্বক, স্বদেশীয় শ্বাশত ঐতিহ্য বজায় রেখে, পাশ্চাত্যের নানান উপকরণাদির সংমিশ্রণে এক অভূতপূর্ব নাট্যরস তথা নাট্যশিল্প সৃজিত হল। দেশীয় নাটকের এযাবৎ দৈন্যতা আর সীমাহীন শ্রীহীনতার স্থলে সংযোজিত হলো পাশ্চাত্য সাহিত্যের বীররস আর দৈনন্দিন মানুষের সংঘাতময় দ্বান্দ্বিক জীবনের হলাহল। এক কথায় পাশ্চাত্য সাহিত্য রসে পুষ্ট নাট্যকারের আধুনিক মনন-স্পর্শে ‘কৃষ্ণকুমারী’ কেবল বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মৌলিক নাটকরূপে প্রতিপন্ন হল না, একই সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিকতার সম্মিলনে তা হয়ে উঠলো প্রথম সার্থক তথা বিশুদ্ধ ট্রাজেডি।

নন্টে ফন্টে : শিশু মনের বিকাশ

দীপাঞ্জনা দেব

গবেষক, বাংলা বিভাগ, Seacom Skills University

নন্টে ফন্টের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে কিশোর ভারতী পত্রিকায়, সালটা হল ১৯৬৯। ১৯৭২ সাল থেকে নন্টে ফন্টের চারিত্রিক পরিবর্তন সূচিত হল।নন্টে ফন্টে হল ছবির মাধ্যমে গল্পকথন। সংলাপের উপযুক্ত চিত্র অথবা বিপরীত ভাবে বলতে গেলে চিত্রের উপযোগী সংলাপ। শিশু মনস্তত্ত্ব ভালো বুঝতেন নারায়ণবাবু।নারায়ণবাবুর উদ্দেশ্য কী ছিল? উদ্দেশ্য ছিল শিশুপাঠককে নির্মল আনন্দ দান। উদ্দেশ্য ছিল তার রচনা এবং চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে শিশু নিজেকে আবিষ্কার করুক।সময়টা পুজোর ছুটি। স্থান স্কুল বোর্ডিং। কেক চুরি অপরাধ নিশ্চয়ই কিন্তু দেখা যাচ্ছে নন্টে ফন্টে নিজেরা খাবে বলে কেক চুরি করেনি, বন্ধুদের সঙ্গে চুরি করা কেক ভাগাভাগি করে নিয়েছে। তাই এক্ষেত্রে চুরিটা তেমন গুরুতর অপরাধ হয়ে ওঠেনি। নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন লেখক তথা এই এপিসোডটির পরিকল্পনায়। নন্টে নিজের হাতে

ক্যামেরা বানিয়েছে। নতুন ক্যামেরার উদ্বোধন করতে প্রথম ফন্টের ছবি তুলতে মনস্থ করে, ফন্টে তো খুব খুশি। নন্টের দাদুর হাঁপানিটা বেড়েছে। তাই ডাক্তার ডাকতে হবে। সে ফন্টের শরণাপন্ন হলে দুজনে ডাক্তারবাবুর কাছে হাজির হয়। 'নেপোয় মারে দই'— এই প্রবাদ বাক্যটিকে অবলম্বন করে নারায়ণবাবু একটি মজাদার এপিসোড তৈরি করলেন। একটা মিষ্টি গন্ধ পায় নন্টে ফন্টে। তারা হদিশ পায় গন্ধটা আসছে কেল্টুদার ঘর থেকে। নববর্ষ উপলক্ষ্যে কেক ঘরে স্পেশাল কেকের অর্ডার দিয়েছে নন্টে ফন্টে।বোর্ডিং-এ রোজ থালা বাটি ঘটি চুরি যাচ্ছে। থানাও কিছু করতে পারছে না। সুপারকে তাই চোর ধরার ব্যবস্থা করতে হল।কেল্টু জানতে চাইল নন্টে ফন্টে এবারে কী বাজি তৈরি করছে। ওরা জানাল কালীপূজায় তুবড়ি না করে এবার রঙমশাল এবং হাত পটকা বানাবে। নন্টে ফন্টের এপিসোডগুলির চমৎকারিত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে, সেইসঙ্গে আঁকা কার্টুনগুলি অসামান্য। নন্টে ফন্টে, কেল্টু, সুপার প্রত্যেককেই কার্টুন দেখে চিহ্নিত করা যায়।

নগর সংস্কৃতির কেন্দ্র রূপে কোলকাতার উদ্ভব এবং তার অন্ধকার

দেবলীনা সেন

গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কোলকাতা নামটি শুনলেই প্রথমে যে ছবি মাথায় আসে– ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজধানী, প্রাচ্যের প্যারি, বিবিধ জাতি-ধর্ম-বর্ণের মিলনক্ষেত্র, বাঙালির অহংকার, নব সভ্যতার জন্ম পীঠ, প্রাসাদকীর্ণ কোলকাতা! কিন্তু এই প্রদীপের তলায় অন্ধকার থাকাটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। তাই হয়ত হরিহর শেঠের প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় এ শোনা যায় এমন কথা – 'জাল, জুয়াচুরি মিথ্যে কথা/এই তিন নিয়ে কলকাতা।' স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন এসে যায় কেন এই বৈপরীত্য? এই প্রবন্ধে এর কারণ অনুসন্ধানের একটা চেষ্টা থাকবে। আসলে কলোনিয়াল কোলকাতায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমন কিছু পলিসি গ্রহণ করেছিল, এমন এক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা তৈরী করেছিল, এমন একটা সোস্যাল হায়ারার্কি, ক্ষমতা, 'ডিসএমপাওয়ারমেন্ট' এর জাল তৈরি করেছিল, যার অনিবার্য ফলস্বরূপ নগর কোলকাতা জন্ম দিল এমন সমস্ত অপরাধের যা প্রিকলোনিয়াল বাংলায় দেখতে পাওয়া যায়নি। এবং সেই অপরাধের পরিমাণ ও বীভৎসতা এত মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল, যে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়েছিল ব্যবস্থা নিতে, যার প্রত্যক্ষ ফল আজকের ভারতবর্ষের থানাকেন্দ্রিক পুলিশ ব্যবস্থা। উনিশ শতকের শেষ দিকে ও বিশ শতকের শুরুতে একে একে যখন লেখা হচ্ছে বাঁকাউল্লার দপ্তর, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তর, গিরিশচন্দ্র বসুর সেকালের দারোগার কাহিনী, তাতে ধরা পড়ে যায় নগর কোলকাতার আলোকউজ্জ্বল চেহারার নীচের বীভৎসতা। আসলে আঠেরো শতকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকেই কোলকাতা হয়ে উঠছিল ধনীদের শহর। ধনীদের অতুল ঐশ্বর্য ও চরম বিলাসিতা লোভী করে তুলেছিল অপরাধ জগতের মানুষকে। কোম্পানীর

কর্মচারী এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীরা প্রভূত অর্থ উপার্জন করতে শুরু করল। বাঙালী ধনীরাও থেমে থাকেননি। জমিদার, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দিরা বেড়ালের বিয়েতে, পায়রা ওড়ানোতে, শ্রাদ্ধে যে বিপুল পরিমাণ টাকা ওড়াতে থাকলেন, তার প্রমাণ মেলে হুতোম প্যাঁচার নকশায়। গরীব চাষী তাঁতিদের রক্তজল করা শ্রম শুষে ফুলেফেঁপে উঠছিলেন পরশ্রমজীবি শ্রেণী। এই প্রবল আর্থসামাজিক বৈষম্য যে অপরাধের জন্ম দেবে এতে অস্বাভাবিকতা নেই। বাঁকাউল্লার ভাষায় 'সে বড় বিষম কাল। জোর যার মুলুক তার এই চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য তখন দেশের লোকের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছিল,প্রত্যক্ষ প্রমাণও হাতে হাতে মিলিত। চুরি ডাকাতি, জালজুয়াচুরি, খুন জখমের তো কথাই ছিল না।' কারা ছিল এই কোলকাতার অপরাধী? কেবল দারিদ্রের কারণে, অভাবের কারণে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি সেখানে? না কি সমাজের উঁচুতলার মধ্যেও দেখা গেছে অপরাধপ্রবণতা? কী ধরনের অপরাধ ঘটত নগর কোলকাতায়? তার সঙ্গে কি প্রিকলোনিয়াল বাংলার যে ধরনের অপরাধ তার কোনো পার্থক্য ঘটে গেছে? রঘু ডাকাত বা বিশে ডাকাতের মত প্রকাশ্যে দম্ভ দেখিয়ে ডাকাতি নয়, বরং কলোনিয়াল কোলকাতার অপরাধের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম জটিলতা, এমন মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি দেখা গেল, যা এর আগে লক্ষ করা যায়নি। তাহলে কী নগর কোলকাতার বীজের মধ্যেই এমন কীট দংশন রয়ে গিয়েছিল, যা বাধ্য করল পরবর্তী সময়ে এই সব অপরাধের জন্ম দিতে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার একটা প্রচেষ্টা থাকবে এই প্রবন্ধের মধ্যে।

ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' উপন্যাসে লোকসঙ্গীত ও জীবন

নবগোপাল সামন্ত

কলেজ শিক্ষক (SACT, Category-1), যোগদা সৎসঙ্গ পালপাড়া মহাবিদ্যালয়

গবেষক, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি,

ভারতবর্ষ হল সংস্কৃতির কৃষ্টি ভূমি। এই দেশের একটি অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ড নিয়ে 'সমরেশ বসু' পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র 'আড়কাঠি' উপন্যাসটি লিখতে সক্ষম হয়েছেন। উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম বাংলার ইতিহাস। লেখক আদিবাসী বসু – শবরদের জীবনকথা এবং তাদের সংস্কৃতি নিয়ে একশ্রেণীর ফোক ব্যবসায়ীদের দ্বারায় কিভাবে পণ্যায়ন হয়েছে তা অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। ঘটনা প্রবাহকে গতি দান করার জন্য উপন্যাসের ভাষায় লোকসঙ্গীতের ব্যবহার করেছেন। যার দ্বারায় উপন্যাসে অবস্থানকারী চরিত্রগুলির মনোজগৎ, অব্যক্ত ইচ্ছা ও আকাঙ্খা পাঠকের কাছে সহজভাবে প্রকাশ পায়। আসলে গদ্যে যা প্রকাশ করা সবসময় সহজ হয় না, সংগীতের সুরে তা স্পষ্ট করা যায়। সে কারনে লেখক তাঁর জীবনদৃষ্টিতে উপন্যাসে লোকমানুষের সংগীত ব্যবহার করেছেন।

সত্তরের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ও ভাঙনের সংস্কৃতি

নবীনচন্দ্র দে

গবেষক (বাংলা বিভাগ), পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

রক্তে মিশে থাকা বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি নিয়ে জন্ম হয় এক শ্রেণিচেতনার। যার উৎস ঔপনিবেশিকতার গর্ভে। কিন্তু বিস্তার যাপনের জল ও বায়ুতে। অর্থনৈতিকভাবে উচ্চ ও নিম্নবিত্তের অবস্থানই সমাজে মুখ্য। কিন্তু এরই মাঝে জীবনীসত্তার বিস্তার ঘটিয়ে আবির্ভাব ঘটে মধ্যবিত্তশ্রেণির। যার দুই চোখ জুড়ে থাকে উদীয়মান ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রাস করে ক্রমশ আধুনিক হবার স্বপ্ন। কিন্তু রাইটার বা কেরানি হিসেবে গড়া হয় তার পরিসর। যদিও মধ্যবিত্ত মানস *শুধু কেরানি* হয়েই রইল না। দশকের মোড়ে মোড়ে বুর্জোয়া মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, *তেলেনাপোতা আবিষ্কারের* পথে নামল। যার মধ্যে থেকে উঠে এলো সমাজ–রাজনীতি, শিক্ষা–সংস্কৃতির পাল্টে যাওয়া অভিব্যক্তি। আসলে বাঘের গর্ভ থেকে শুধু হিংস্র বাঘ জন্মায়। আর হরিণের গর্ভ থেকে হরিণ শিশু। কিন্তু মধ্যবিত্ত নিজের গর্ভে কেবল মধ্যবিত্তকেই পোষণ করে না। বাঘের থেকে হিংস্র, সাপের থেকে বিষধর, শিয়ালের চেয়েও ধূর্ত মধ্যবিত্ত সত্তাকে ভূমিষ্ঠ করে থাকে। যারা কখনো কেড়ে নেয় ক্ষুধার্তের মুখের গ্রাস। আবার কখনো দু'হাতে ভরিয়ে দেয় দরিদ্রের ঝুলি। তাই জন্ম বিদ্রোহী মধ্যবিত্তসত্তা অবলীলায় জায়গা পেল বাঙালির মানসে, বাংলা সাহিত্যে। প্রশ্ন উঠতে পারে, রাজঐতিহ্যকে ভুলে আজ কেন মধ্যবিত্ত নিয়ে এত টানাটানি? নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) এর উত্তরে বললেন, *লেখকেরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত, পাঠকেরাও তাই। সুতরাং সাহিত্য যদি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী না হয়, তাহলে তা সত্যনিষ্ঠ হবে না, বস্তুনিষ্ঠও হবে না।... মধ্যবিত্ত লেখক লেখে মধ্যবিত্ত পাঠক পরে।* তা বলে কিষাণ মজুরদের বাদ দিলেও চলবে না। ইতিহাসের সূত্র ধরে দেখা যায় কল্লোলেরাই প্রথম আঘাত আনে সাহিত্যের স্থায়ী সত্তায়। কাহিনিকে নামিয়ে নিয়ে যায় নিম্ন-মধ্যবিত্তের পর্ণকুঠিরে। সত্যনিষ্ঠকে স্থান দেয় বস্তুনিষ্ঠের পাতায়। তবু স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারেনি তাঁরা। ইতিহাসের নিয়মে আমরা ছোট্ট ছোট্ট পায়ে এগিয়ে চলি অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে। যে অভিজ্ঞতা জাগিয়ে তোলে জীবনবোধের নানা অভিমুখ। যা তারাশঙ্কর-বিভূতি-মানিকের লেখায় রূপ নেয় একভাবে। চারের দশকে সুবোধ-নারায়ণ-মনোজ-কমলকুমারের লেখায় প্রকাশ পায় দেশভাগের স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে। অপরদিকে পঞ্চাশ ষাটের দশকে মহাশ্বেতা দেবী-সুনীল-শীর্ষেন্দু-দেবেশ-মতি নন্দীর লেখায় এসেছে জীবনের বহুগামীতাকে কেন্দ্র করে। তাই সত্তরে লিখতে আসা লেখকেরা উপেক্ষা করতে পারেননি উত্তাল সময়ের বিপ্লবী মানসকে। তাদের হাতে সাহিত্য কেবল art for art's sake হয়েই রইল না। হয়ে উঠল মধ্যবিত্তের বস্তুনিষ্ঠ জীবনের সত্যনিষ্ঠ ছবি।

মধ্যবিত্ত মনন সম্পর্কে কোনো কথাই কখনো সার্বিক নয়। জীবকোষের অভিব্যক্তি থেকে দ্রুত ঘটে মনের অভিব্যক্তি। তাই যে মধ্যবিত্তকে স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫১) *মানুষ রতন* বলে চিহ্নিত করেন, সেই

মধ্যবিত্তই কিন্নর রায়ের (১৯৫৩) চোখে *হাইব্রিড* বলে প্রতিপন্ন হয়। বিত্ত শব্দটা একসময় শুধুমাত্র মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে চিহ্নিত করত। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতির মুক্তদুয়ার সেই নিয়মের ধারাবাহিকতা ভেঙে দিয়েছে। তাই আজ ড্রাগের নেশা মধ্যবিত্ত যুবকের মনে *মহাপৃথিবীর* ছবি আঁকে। ষাটোর্ধ্ব মানুষটি নিঃসঙ্গতা কাটাতে *এন্টারটেডমেন্ট আওয়ারের* কথা ভাবে। *আমি সমীর কে খুঁজছি* মানে নিজের উন্নয়নের নির্জন স্বাক্ষর এঁকে দিতে চাইছি দারিদ্র্যে ভরা সমীরের বুকে। তাই উচু-নিচু ভালো-মন্দ সবই মিশে যাচ্ছে এই শ্রেণিযন্ত্রণার চোরাবালিতে। যে চোরাবালি ক্রমশ স্পষ্ট করছে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যেকার অর্থনৈতিক দ্বিচারিতাকে। মধ্যবিত্ত সেখানে বাঘবন্দী খেলার প্রতিযোগিমাত্র। না পারছে খেলা ছাড়তে, না পারছে মন দিয়ে খেলা খেলতে।

তুঙ্গভদ্রার তীরে উপন্যাস : ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়েও হয়ে উঠেছে রোমান্টিক উপন্যাস

নম্রতা বিশ্বাস

ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আধুনিক কথা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনলে প্রথমেই আমাদের মনে পরে যায় ব্যোমকেশ বক্সীর কথা। তাঁর রচিত গোয়েন্দা গল্পগুলো যেমন বিখ্যাত, তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতেও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা অবিস্মরণীয়।

আলোচ্য উপন্যাস 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্তর্গত।১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দের সমকালিক বিজয়নগর রাজ্যকে কেন্দ্র করে উক্ত উপন্যাসটি রচিত হয়েছে।

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটি যদিও ঐতিহাসিক উপন্যাস কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে প্রেমের কাহিনীই হয়ে উঠেছে মুখ্য বিষয়। উপন্যাসটির মধ্যে তিনটি প্রেমের কাহিনী লক্ষ করা যায়। এক, বিদুৎমালার-অর্জুনবর্মার প্রেমকাহিনী; দুই, রাজা দ্বিতীয় দেবরায়-মণিকঙ্কণার প্রেমকাহিনী; তিন, বললাম-মঞ্জিরার প্রেমকাহিনী। তিনটি প্রেমকাহিনী এগিয়েছে তাদের নিজস্ব নিজস্ব ভঙ্গিতে।

উপন্যাসে দেখা যায়, কলিঙ্গরাজ ভানুদেব তাঁর কন্যা বিদ্যুৎমালাকে যুদ্ধের পর শান্তির শর্তানুসারে বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের সঙ্গে বিবাহের জন্য পাঠিয়েছিলেন নদী পথে। যদিও বিদুৎমালার এই বিবাহে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। এই নদীপথে যাত্রাকালীনই অর্জুনবর্মার সঙ্গে বিদুৎমালার পরিচয়

ঘটে। ঘটনাক্রমে ঝড়ের প্রভাবে বিদুৎমালা ও অর্জুনবর্মা ছিটকে এক অপরিচিত দ্বীপে গিয়ে পরে। বিদ্যুৎমালার মনে তখন থেকেই অর্জুনবর্মার প্রতি ভালোবাসা জন্মায়।

উপন্যাসে লক্ষ করা যায় অনেক চড়াই-উতরাই, অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে, বিদুৎমালার যে প্রেম অর্জুনবর্মার প্রতি সেই প্রেমের জোরে তাঁদের প্রেম সার্থকতা পায়।

অন্যদিকে বিদ্যুৎমালার সঙ্গে আগত তাঁর বৈমাত্রেয় বোন মণিকঙ্কণা রাজা দ্বিতীয় দেবরায়কে প্রথম দেখাতেই ভালোবেসে ফেলে, সে মনে মনে চাইতো রাজা যেন বিদ্যুৎমালার সঙ্গে তাঁকেও গ্রহণ করে। রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ও মণিকঙ্কণার সঙ্গে কাটানো সময় উপভোগ করতেন। তাঁর মনেও মণিকঙ্কণার প্রতি জন্মেছিল 'নিগূঢ়-ঘনিষ্ঠ একটি রসোল্লাস'।

বিদ্যুৎমালার সঙ্গে দ্বিতীয় দেবরায়ের যদিও বিবাহ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ঘটনাক্রমে তা হয়নি, এবং রাজ্যবাসী সকলেই জানতো বিদুৎমালার সঙ্গে রাজার বিবাহ হবে ফলে রাজা এখানে একটি অভিসন্ধি করে। রাজকন্যাদ্বয়দের নাম পরিবর্তন করে দেয় বিদুৎমালা হয়ে যায় মণিকঙ্কণা এবং মণিকঙ্কণা হয়ে যায় বিদুৎমালা।

এই দুই প্রেমকাহিনীর পাশাপাশি উপন্যাসে বলরাম-মঞ্জিরার প্রেমকাহিনীও লক্ষ করা যায়। বলরাম ও অর্জুনবর্মা কলিঙ্গ রাজকন্যাদ্বয়দের সাথে আগত অতিথি হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা রাজাকে নিজেদের প্রতি দৃষ্টিগোচর করে দেশ রক্ষার গুরুত্ব দুটি কাজ গ্রহণ করে, এর ফলে রাজা তাঁদের থাকার ব্যবস্থা গুহার মধ্যে করেন। সেইখানেই মঞ্জিরার সঙ্গে বলরামের সাক্ষাৎ ঘটে, মঞ্জিরা তাঁদের জন্য খাবার নিয়ে আসতো। বলরাম কামার হওয়ার পাশাপাশি গান করতেও জানতো এবং মঞ্জিরা বাঁশি বাজাতে জানতো। এইভাবেই তাঁদের মধ্যে ঘটে ভালোবাসা।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব উপন্যাস শেষ হয়েছে Happy Endings দিয়ে। ফলে 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটির শেষে দেখা যায় সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ঘুচে গিয়ে প্রেমের সার্থকতা স্বরূপ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথির দিন তিনটি বিবাহ একসাথে হতে। ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়েও 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের মধ্যে প্রেমের সার্থকতার জন্য যেসকল কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তাতে সত্যিই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে রোমান্টিক উপন্যাসের দ্যোতক।

বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের মেলবন্ধনে বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকের নির্বাচিত বিদেশি লেখকগণ

নির্মল কুমার বিশ্বাস
গবেষক, সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি, বোলপুর, বীরভূম

বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল সমৃদ্ধিতে দেশিয় সাহিত্য শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশিয় কিছু সেবককে পাওয়া যায় যাঁরা তাঁদের সীমিত সাধ্য আর অপরিসীম উৎসাহে বাংলা সাহিত্যের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকে আরো বৈচিত্রময় করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশ শতকের লেখকগণের প্রয়াস প্রথম শ্রেণির সাহিত্য শিল্পের পর্যায়ভুক্ত। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে আরো বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করতে, সেইসঙ্গে বিশ্ব সাহিত্যের রত্নরাজি দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে তাঁদের বহুবিধ কর্মপ্রয়াস এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলা সংস্কৃতি চর্চায় বিনয় ঘোষ ও তাঁর সংস্কৃতি ভাবনা

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চা যেভাবে পরিমাণগত প্রাচুর্য ও গুণগত উৎকর্ষের যৌগপত্যে সম্পাদিত হয়েছে সংস্কৃতিতত্ত্বের আলোচনা ততখানি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয় নি। যদিও সাহিত্যের অধিকারীজনেরা সে বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাংলার ইতিহাস নেই বলে আক্ষেপ করেছিলেন সে আক্ষেপ কিন্তু ছিল প্রকৃতপক্ষে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের অজ্ঞতা ও অবহেলার দিকে নির্দেশিত। সাহিত্য ও সংস্কৃতি শব্দদুটি প্রায় এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হলেও চর্চার ক্ষেত্রে 'সংস্কৃতি' বা 'সংস্কৃতি তত্ত্ব' অদ্যাবধি ততখানি জনপ্রিয় ও চর্চিত বিষয় হয়ে উঠতে পারে নি। প্রাবন্ধিক শ্রী বিনয় ঘোষের(১৯১৭ – ১৯৮০) নিরলস সংস্কৃতি চর্চা সেই সূত্রে বাংলা ভাষায় একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ রূপে বিবেচিত হতে পারে।

সংস্কৃতি সম্পর্কে বিনয় ঘোষের যে আলোচনা তাকে কয়েকটি উপধারায় বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

ক. সংস্কৃতির তত্ত্বগত ভিত্তি সংক্রান্ত আলোচনা

খ. বাংলার নবজাগৃতি ও তার মূল্যায়ন

গ. নগর সংস্কৃতি ও তার বিভিন্ন দিক

ঘ. বাংলার লোকসংস্কৃতির পরিচয়

সংস্কৃতির বিবিধ ধারায় বিচরণকারী প্রাজ্ঞ এই ব্যক্তিত্বের সংস্কৃতি ভাবনা পর্যালোচনা সূত্রে বঙ্গ সংস্কৃতির বহুমাত্রিকতার পরিচয় দান এই নিবন্ধের প্রাথমিক উদ্দেশ্য রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। সংস্কৃতিকে যদি আমরা এক্ষেত্রে ভিত্তি বা base রূপে কল্পনা করি তবে কোন্ সাহিত্যগত অধিসৌধ বা super structure র দ্বারা নির্মিত হয়েছে কিংবা সেক্ষেত্রে বিবর্তনের কোন্ ইঙ্গিত আমাদের লভ্য হচ্ছে তা ও অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

বাংলা প্রবাদ ও ট্যাবুর পরম্পরায় স্বচ্ছতা : করোনা অতিমারির অভিজ্ঞতা

পর্ণা মণ্ডল

পিএইচ.ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

পরম্পরাবাহিত হয়ে বাংলা প্রবাদ ও ট্যাবুর প্রাসঙ্গিকতার নবপ্রায়োগিক রূপ সহজাতভাবে প্রতিভাত হয়ে চলেছে মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে। ঠিক যেমন তুর্কি আক্রমণ সমকালীন সময়কে অন্ধকার যুগ বলা যায় কিনা, সে বিষয়ে সমালোচকদের মতামত আছে, তেমনি যে কোনো আপদকালীন সময়ে মানুষের প্রাণরক্ষার তাগিদের চেয়ে প্রত্যক্ষ সত্য কিছু নেই। যেমন একবিংশ শতাব্দীর করোনা অতিমারির সময়েও একথা সত্য। কিন্তু যেকোনো বিপর্যয়ের পরোক্ষ সত্যের মূল্যও নেহাত কম নয়। তুর্কি আক্রমণের পর নয়তো বাংলা মধ্যযুগের দীর্ঘ পরিসর আমরা উপহার পেতাম না। ঠিক তেমনি প্রতি সঙ্কটকালের মজ্জায় সাহিত্য তার নিজস্ব চলন বজায় রেখেছে। সাহিত্যের তেমন বিশেষ রূপ লোকসাহিত্য লোকমুখে প্রচলিত জীবন্ত সাহিত্যধারা। আলোচ্য নিবন্ধে লোকসাহিত্যের দুই অন্যতম ধারা প্রবাদ ও ট্যাবুকে চিহ্নিত করা হয়েছে, একবিংশ শতাব্দীর করোনা অতিমারির প্রেক্ষাপটে এই ধারাগুলির প্রাসঙ্গিকতা ও নবজন্মের অনুসন্ধান লক্ষ্যে। স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সচেতনতা ও স্বচ্ছতা সম্পর্কে সজাগ হওয়ার এক হাতিয়ার হতে পারে, লোকসাহিত্যের প্রবাদ ও ট্যাবু। নিগূঢ় ব্যাখায় অবশ্যই প্রবাদ ও ট্যাবুতে আছে সামাজিক ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি। তাই পূর্ববাহিত এই ধারাগুলি নবযুগে নবসঙ্কটে যেমন প্রয়োগ করা যায়, তেমনি নতুনভাবে সৃষ্ট এমন বাক্যবন্ধ এগিয়ে চলে কালের স্রোতে প্রবাদ বা ট্যাবুর তকমা জয়ের উদ্দেশ্যে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সমাজ ব্যবস্থা

পার্থজিৎ বেরা

ছাত্র, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

'ছোটগল্প গুলোর মধ্যে পাই সুখ দুঃখ মিলন বিরহ পূর্ণ মানব সমাজে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা।'

-- (প্রমথনাথ বিশী)

সাহিত্য যুগ প্রসূত। বাস্তবতার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। সময়ের সাথে সাথে মানুষের মন চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটে। সমকালীন সমাজকে উপেক্ষা করে কোন সাহিত্যিক তার শিল্পকর্ম করতে পারেন না। সাধারণ মানুষের চেয়েও তারা বেশি কাল সচেতন। শিল্পীর কল্পনার রঙের স্পর্শ যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বাস্তব,তার সঙ্গে সংবাদের কোন পার্থক্য নেই। তাই সাহিত্যিক বস্তু জগৎ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে, কল্পনা মিশিয়ে তার সাহিত্যে প্রতিফলন করে, তখনই সাহিত্য হয়ে ওঠে বাস্তববাদী। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির মূল উৎস পটভূমি আমাদের পরিচিতি ও বাস্তব জীবনের ক্ষেত্র থেকে গৃহীত এবং তাকে রূপায়িত করার সময় কল্পনার স্পর্শ যে তাতে লাগেনি এমনও নয়। কবিগুরু গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনলীলা দেখেছেন এবং সহিষ্ণু স্নেহের সঙ্গে তাকে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্যত্র এমনতর সমবেদনার প্রসারিত দৃষ্টি চোখে পড়ে না। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি সাধারণ সমস্যার দরিদ্রতার প্রতি সুমধুর,সুখের গান ও বিষাদ বিধুর দুঃখের কান্না। সাধারণ জীবনকে কবি অপূর্ব মূল্যে তার সাহিত্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানব সমাজ প্রভাব ফেলল তার গল্পগুলিতে। গ্রাম্য জীবনের খন্ড চিত্র জায়গা করে নিল তার ছোট গল্পে। মানুষের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা তার গল্পের উপজীব্য হয়ে দাঁড়ালো। তার দৃষ্টিপথে এসে পড়ল বেশ কিছু সামাজিক সমস্যা,জাতিভেদ, বধূ নির্যাতন,পণপ্রথা প্রভৃতি। উনিশ শতকে নবচেতনার ফলস্বরূপ দেখা গিয়েছিল মধ্যযুগীয় জীবন যাত্রার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আধুনিক জীবন যাত্রার উদ্বোধন। যুক্তিনিষ্ঠা এবং বিজ্ঞান চেতনা মানুষকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে শেখালো,বাংলার জাগরণের প্রান সত্তা হলো মানব স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জমিদারির কার্যকলাপে উত্তরবঙ্গে গিয়ে তিনি কৃষক, মজুর, তাঁতি,জেলে প্রভৃতি সমাজের নিম্নবর্গ ও অন্তজ শ্রেণীর মানুষের কথা কে তুলে ধরেছেন- পনরক্ষা(তাঁতি), হালদার গোষ্ঠী (জেলে),অনধিকার প্রবেশ (ডোম) রবিবার(খালাসী)। সমাজের শ্রেণী সম্পর্কের মধ্যকার দ্বন্দ্ব,পিতৃপুরুষের সঙ্গে উত্তর পুরুষের চিন্তা গত বিরোধ আবার রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণগুলো বিশ্লেষণ করেছেন কবি। ব্যর্থতা থেকে উত্তরণের জন্য ব্যক্তির মানসিকতা ও সমাজ পরিবর্তনের কথাও তিনি তুলে ধরেছেন তার বিভিন্ন ছোটগল্পে। কবিগুরু ছোট গল্পকে এক নতুন আঙ্গিকে প্রাণ দিয়েছেন, যা এ সমাজে মানুষের চলার পথকে ভাবতে শেখায়, চিনতে শেখায় । তার গল্পের চরিত্ররা এক সংগ্রাম মুখর হয়ে গড়ে তুলতে চায় এক শোষণমুক্ত সমাজ।

ভারতসন্ধানী লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পার্বতী দাস

প্রাক্তন এম. ফিল গবেষক

বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকের পাঁচের দশকের একজন অন্যতম কথাকার হলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। বিশ শতকের চার-পাঁচের দশক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলেও দেশভাগের যন্ত্রণা, মন্বন্তরের ছায়া, বেকারত্ব ভারতীয় জনজীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সাহিত্য যেহেতু সমাজেরই প্রতিচ্ছবি তাই এই সময়পর্বে যেসকল সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁরা মূলত সমকালীন সময় ও সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতের ছবিটাই তাঁদের রচনায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তবে এই সময়পর্বে আবির্ভূত হয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে বিচরণ করেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তিনিও তাঁর গল্প-উপন্যাসে ভারতবর্ষের ছবিই এঁকেছেন। তবে সেই ভারতবর্ষের অবস্থান পরিচিত পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। রাঢ়বঙ্গের কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসুরী রূপে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের আবির্ভাব ঘটলেও তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে ভিন্ন এক রাঢ়জগতের ছবি, যে রাঢ়জগতে প্রকৃতি ও মানুষ একে অপরের সমার্থক। ভারতবর্ষের আদিম প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির অন্তর্গত স্বাধীন সন্তানদের কথাই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর রচনায় রূপ দিতে চেয়েছেন। আর তার মধ্য দিয়ে ভারত আত্মার মূলসুরটিই অনুরণিত হয়েছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের এই ভারতসন্ধানী হয়ে ওঠার পিছনে তাঁর পরিবারজীবন এবং ব্যক্তিজীবন দুইয়ের-ই প্রভাব ছিল। এক অসাম্প্রদায়িক, শিক্ষিত পরিমন্ডলে বড়ো হয়েছিলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। সেইসঙ্গে মুর্শিদাবাদের উদার প্রকৃতি তাঁকে সর্বদা বাইরের জগতের হাতছানি দিত। পরবর্তীকালে আলকাপের সূত্র ধরে লেখক মাটির কাছাকাছি মানুষদের খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফলে গ্রামভারত ও প্রকৃতি লেখকের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। রাঢ়ের রুদ্র ও স্নেহময়ী প্রকৃতির মতো এখানকার মানুষেরাও একইসঙ্গে কঠিন ও কোমল। আদিম প্রকৃতির সঙ্গে সংলগ্ন এই মানুষদের প্রেমে-অপ্রেমে, সুখে-দুঃখে, লোভে-ঈর্ষায়, কামনায়- হতাশায় দ্বন্দ্বমথিত যে জীবন তার অন্তরঙ্গ রূপ রচনা করেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। শুধু গ্রামভারত নয়, নগরভারতের চিত্রও তাঁর অনেক রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়। তবে গ্রামভারতের ছবি আঁকতে লেখক যতটা স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছেন নগরভারতের ক্ষেত্রে ততটা নয়। তাই মনে হয় নগরজীবন যেন লেখকের স্বভূমি নয়। কিন্তু নগরভারত সম্পর্কে লেখক যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তা তাঁর গুটিকয়েক লেখার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়। গ্রাম এবং নগরের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের রচনায় উঠে এসেছে মুসলিম সমাজের অন্দরমহল ও অন্তরমহলের চিত্র, যার মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভারতের আস্বাদন পাওয়া যায়।

ভারতীয় সাহিত্য এখনও অনেকাংশেই ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণ। কিন্তু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মনে প্রাণে ভারতীয় লেখক। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্রের কথা অনুযায়ী বলা যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর জন্মভূমিটিকে নিজের হাতের তালুর মতোই চিনতেন। তিনি ডুব দিয়েছেন এদেশের লোকায়ত সংস্কৃতির গভীরে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সেই বিরল কথাশিল্পীদের মধ্যে একজন, যিনি তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই শাশ্বত ভারতবর্ষের ছবি, স্বাধীনতা পরবর্তী যে ভারতবর্ষ এদেশের কথাশিল্পে, কবিতায়, নাটকে নিজের মুখটি দেখাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল। এদেশের জল হাওয়ার মধ্যেই পরিপুষ্ট হয়েছে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্য। আর এভাবেই তিনি বাংলা সাহিত্যকে ইউরোপীয় সাহিত্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে তুলেছেন।

ভগীরথ মিশ্রের ‘চারণভূমি’ উপন্যাসে লৌকিক বৃত্তিগত ভাষার পরিচয়

পিউ চক্রবর্তী

পি.এইচ.ডি. গবেষিকা, বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর

পৃথিবীর আদিমতম এবং মৌলিক বৃত্তি হচ্ছে পশুপালন। ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী খ্রিষ্টপূর্ব ১১০০০ বছর পূর্বে পশুপালন শুরু হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। পূর্বে গৃহপালিত পশু হিসাবে গরু, ছাগল, উট, ভেড়া প্রভৃতি পালন করা হত। ধীরে-ধীরে যখন গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল তখন পশুদের স্বার্থে সর্বোপরি নিজেদের জীবন, খাদ্য এবং বস্ত্রের স্বার্থে মানুষ পশুদের নিয়ে ভ্রাম্যমাণ জীবন আপন করে নিল। এই বৃত্তির সাথে যুক্ত মানুষদের নানান নামে অভিহিত করা হয়। পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গে এই বৃত্তির মানুষরা ‘বাগাল গোষ্ঠী’ হিসাবে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গ এবং এর দুই পার্শ্ববর্তী জেলায় ‘ভেড়া-চড়োয়া’ নামে পরিচিত মানুষ বহু বছর ধরে হাজার হাজার ভেড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলার হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলা, ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, হাজারিবাগ এবং বিহার মুলুকের ভিতর দিয়ে ভেড়া-চরোয়ারা পথ অতিক্রম করছে। পরিভ্রমণের কারণে এদের মুখের ভাষায় যুক্ত হয়েছে নানা স্থানের ভাষা-বৈশিষ্ট্য। বৃত্তির কারণে বাড়ি থেকে দূরে যাযাবর জীবন। এই বিচরণ, যাযাবর জীবন এবং পশুপালন সমার্থক হয়ে উঠেছে। তাদের নিয়েই ভগীরথ মিশ্রের অনন্য উপন্যাস ‘চারণভূমি’। দেশ থেকে দেশান্তরে, বংশ থেকে বংশ ধরে পাল-পাল ভেড়া নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পথে হেঁটে চলেছে এরা। নবীন বাগালেরা বদলে ফেলছে নিজেদের পেশা। নিরন্তর পশুজীবন আর বেছে নিচ্ছে না। এই প্রবন্ধটি উপন্যাসে পশুপালন বৃত্তির সাথে যুক্ত চরিত্রগুলির দ্বারা উচ্চারিত ভাষা বিশ্লেষণের পাশাপাশি ভেড়ার পাল এবং পশুপালন জীবনের ঐতিহ্যগত পরিচয় সম্পর্কে।

বাংলা দলিল-দস্তাবেজ : কৃষি-অর্থনীতি বিকাশের প্রামাণিক ঐতিহাসিক উপাদান

ড. পিন্টু শীট

অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, গড়বেতা কলেজ

কৃষিনির্ভর গ্রামীণ বাংলার আর্থিক বিকাশের ধারায় কৃষির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তথাকথিত রুগ্ন কুটির শিল্পগুলি হয়তো জনজীবনে অতিসামান্য পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল কিন্তু, তবুও বলা চলে গ্রাম জীবনে অর্থ-কাঠামোর মূল ভিত্তি স্তম্ভ ছিল কৃষি। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির ইতিহাস জানা সম্ভব হয়নি মূলত উপাদানের অভাবে। সেই সঙ্গে বাংলার কৃষি-অর্থনীতির ইতিহাসও। এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য করার সনদ লাভ এবং পরবর্তী সময়ে ইংরেজদের শাসনব্যবস্থা কায়েম করায় নানাদিকে জনজীবনে যে প্রভাব পড়তে থাকে তাতে কৃষির উপর প্রভাব পড়েছিল বহুল পরিমাণে। বাংলার জমি কুক্ষিগত ছিল রাজা, জমিদার, সমাজের প্রধান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতায়। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের জমির উপর কোন অধিকারই ছিল না। এইসব ভূমধ্যকারীরা যে কোনো প্রকারে সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে কৃষিক্ষেত্রে একপ্রকার 'বেগার' খাটিয়ে কৃষিজাত পণ্য ভোগ দখলে আনত। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পরে ইংরেজ সরকার কৃষিজাত পণ্য থেকে অধিক কর আদায়ের চেষ্টায় জমির উপর ভূমধ্যকারীগণের অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করে। তারই ফলশ্রুতিতে ঘটে 'পাঁচশালা', 'দশশালা' বন্দোবস্ত। 'পাঁচশালা' বন্দোবস্তে জমিদারগণকে পাঁচ বছরের জন্য কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান। এর ত্রুটি লক্ষ্য করে পুনরায় দশবছরের 'দশশালা' বন্দোবস্ত। আবার এই ব্যবস্থার ত্রুটি লক্ষ্য করে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে জমিদারগণকে শেষে রাজস্ব আদায়ে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দেওয়া হয়। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'প্রথা প্রবর্তনে বাংলার গভর্ণর লর্ড কর্ণওয়ালিশ আশা করেছিলেন জমিদারগণ জমির উপর স্থায়ী অধিকার পেলে নিজ নিজ জমিদারির উন্নতি বিধান কল্পে উৎসাহী হয়ে, একদিকে যেমন কৃষির উন্নতি ঘটিয়ে আর্থিক বিকাশে সহায়ক হবেন তেমনি অপরদিকে প্রজাসাধারণকে 'আপন জন' ভেবে 'বাজে কর' আদায় থেকে বিরত থাকবেন। কিন্তু, বাস্তবে তা ঘটল না। কৃষকরা তো বিন্দুমাত্র উপকৃত হল না অধিকন্তু জমিদারগণের কাছে 'দয়ার পাত্র' রূপে বিবেচিত হতে থাকল। তবে রাজা কিংবা জমিদারগণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে হলে জমি ও কৃষির উন্নতি বিধান করা দরকার। এই চিন্তার প্রেক্ষাপটে আসে জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী কর নির্ধারণ করতে হলে জমির শ্রেণি নির্ণয় প্রয়োজন। এই জেলায় জমির শ্রেণি বিভাজন হল এইরূপ – নিমকীমহল, জলপাই জমি, নাখোরাজ সম্পত্তি, খাসমহল, জলজমি, ডাঙ্গাজমি ইত্যাদি। নির্দিষ্ট সময়ে জমির খাজনা আদায়ের জন্য তৈরি হল 'Sunset Law' বা 'সূর্যাস্ত আইন'। জমিদারী 'কর' আদায়ের জন্য জমিদারগণ জমিদারীকে খণ্ড খণ্ড বিভাজনে ইজারাদার নিয়োগ করলেন। ইজারাদারগণ পুনরায় নিজ নিজ অধিকারভুক্ত জমিকে খণ্ড খণ্ড করে এক একটি খণ্ডের কর আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন 'দরইজারাদার'। আবার মূল জমিদারগণ

রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টায় বহু জমি কোম্পানির হিসেব থেকে লুকিয়ে রাখতেন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি প্রথম এইসব খাস জমি নাখরাজ সম্পত্তি নিজেদের করায়ত্বে এনে জরিপের বন্দোবস্ত করেন এবং জমির উপর প্রজাসাধারণের ন্যায্য অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন' তৈরি করে প্রজাস্বত্ব রক্ষার চেষ্টা করেন। অদ্যাবধি ঐ আইনই প্রজাস্বত্ব রক্ষায় 'রক্ষাকবচ' রূপে কাজ করে আসছে। গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে জমির ভূমিকা কতখানি তা বোঝার কারণেই জমি সম্পর্কিত এই ইতিহাসটুকু স্মরণ করা প্রয়োজন।

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস 'অরণ্য আদিম' : এক প্রাচীন জনজাতির ইতিবৃত্ত

প্রশান্ত কুম্ভকার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ছাতনা চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়, ছাতনা, বাঁকুড়া

রমাপদ চৌধুরীর 'অরণ্য আদিম' উপন্যাসটি অরণ্যবাসী মুণ্ডাদের নিয়ে রচিত একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। এই উপন্যাসের মধ্যে লেখক মুণ্ডা জনজাতির বাস্তব ইতিহাস, জীবনধারা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সুকৌশলে ব্যক্ত করেছেন। গাসি মুণ্ডার দল মালগুজারি অর্থাৎ খাজনার পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সিল্লির অরণ্য-গ্রাম ছেড়ে গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে ঘরবাড়ি, ক্ষেতজমি বানিয়ে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু এখানে এসেও গাসি মুণ্ডা তার দল ও গ্রামকে বিশুদ্ধ রাখতে পারে নি। কোম্পানি কয়লা অঞ্চল হিসেবে জায়গাটিকে চিহ্নিত করে এবং কয়লা খাদান তৈরি করে। সেখানে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। মুণ্ডাদের সংস্কার অনুযায়ী খাদানে কাজ করা পাপ। কিন্তু গাসি মুণ্ডার নিজের মেয়ে রাঙিনাই এক ভিন্ন গোত্রের ছেলে আকুমকে বিয়ে করে গ্রাম ছাড়া হয় এবং খাদানে গিয়ে কাজ নেয়। কাজের বিনিময়ে তারা নগদ টাকা পায়। তাদের দেখাদেখি একে একে সারা গ্রাম তাদের প্রাচীন সংস্কারকে অস্বীকার করে খাদানের কাজে নেমে যায়। ধীরে ধীরে অরণ্য গ্রামটি খনি-শহরে পরিণত হয়। এইভাবে একটি আদিম জনজাতির সামগ্রিক জীবনের আবর্তন বিবর্তন রেখাটি উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক আমদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

অনালোচিত কথাকার তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য ভাবনা

প্রসেনজিৎ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাসাহিত্যে অনালোচিত কথাসাহিত্যিক হলেন তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি 'কাজল' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে পদার্পণ করেন। সময়টা সত্তরের দশক। তারাদাস ১৯৮৭ সালে ১৫ অক্টেবর জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের একমাত্র পুত্র। যদিও অল্প বয়সে তারাদাস পিতৃহীন হয়ে পড়ে। তাঁর মা রমাদেবী এবং মাতামহ ষোড়শীকান্তের স্নেহের আশ্রয়ে শৈশব অতিবাহিত হয়। তিনি শৈশব থেকে পিতৃগৌরবে বেড়ে-ওঠা এবং পরবর্তীকালে নিজস্ব প্রতিভায় সাহিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত 'আশ্চর্য' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। তিনি উপন্যাসের মাধ্যমে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর পিতার 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' উপন্যাসের পরবর্তী অংশ 'কাজল' লিখেছিলেন। তিনি শতাধিক ছোটগল্প এবং প্রায় সাতটি উপন্যাস লিখেছেন। তবুও বাংলা সাহিত্যে তেমন ভাবে আলোচিত হয়নি। তাঁর অমর সৃষ্টি 'তারানাথ তান্ত্রিক'। তারানাথকে সৃষ্টি করেছেন বিভূতিভূষণ কিন্তু সম্পূর্ণতা দিয়েছেন তারাদাস। এছাড়াও বিভূতিভূষণের আত্মজীবনী 'পিতা নোহসি' নামে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা শেষ পর্যন্ত তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। সামগ্রিকভাবে দেখলে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবাদভাবে বিচরণ করেছেন।

তারাদাসের মধ্যে সাহিত্যের প্রথম বীজ বপন করেছিলেন মা রমা দেবী। পিতৃ প্রতিভার সহজাত ও উত্তরাধিকার তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। তিনি নিজেই স্বমহিমায় হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বসাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠক, জীবন দর্শনে তিনি ছিলেন জীবন রসিক। অলৌকিক রহস্য সন্ধানে মানবজীবন পর্যবেক্ষণের যথার্থ শিল্পী। অথচ কুণ্ঠাবোধ সঙ্গত আবেগ পিতৃ মর্যাদার পরিমন্ডলে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই যেন সীমা অতিক্রম না করার কোন কঠিন সংকল্পে তারাদাস বর্ণময় আনন্দময় এক সদালাপী জীবনযাপন করে, পিতার দৃষ্টান্তেই অপেক্ষাকৃত দ্রুততায় ইহজীবনের চারপাশে একটি গণ্ডিরেখা টেনে দিলেন। গত সত্তরের দশক থেকেই বাঙালি সমাজ জীবনে যে ভাঙ্গা-গড়া দেখা দিয়েছে এবং মূল্যবোধের জায়গা পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি নিজেকে কখনো মূল্যবোধের-গড়া থেকে সরিয়ে নেয়নি। সমাজের যে দিকগুলি কলুষিত সে দিক থেকে তারাদাস ছিলেন মুক্ত।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবাদভাবে বিচরণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বলাবাহুল্য সাহিত্যের প্রতি তিনি একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী একথা নির্দ্বিধায় বলা

যেতে পারে। তারাদাস তার বলিবার কথা যথাসম্ভব লিখে রেখে গেছেন। তাঁর মহান পিতার মহতী সৃষ্টির গৌরবে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। আরও অনেক লিখতে পারতেন নিজেকে কার্পণ্যে আবদ্ধ করে রাখলেন এই জাতীয় ক্ষুদ্র সমালোচনার কুশাঙ্কুর তাকে বিদ্ধ করেনি। ২০১০ সালে ১৮ জুলাই তাঁর অকাল প্রয়াণে পিতার ধারাবাহিক জীবনী 'পিতা নোহসি' অসমাপ্ত থেকে যায়। কালের বিচারে তাঁর সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে আলোচিত হবে বলে মনে করি।

সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য চর্চার বহুমাত্রিক চেতনার আলোকে : ঢোঁড়াই চরিত মানসে নিম্নবর্গের সমাজের চেতনার পর্যালোচনা

প্রেমাঙ্কুর মিশ্র

প্রাক্তন ছাত্র, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

নিম্নবর্গীয় সমাজ চেতনা পর্যালোচনায় পূর্বে নিম্নবর্গের ইতিহাস চেতনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা ধারণা থাকা জরুরী। বর্তমানে আধুনিক সময়ে সমাজের নিম্নবর্গের ইতিহাস বিষয়টি বহুল চর্চিত এক বিষয়। যেখানে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তবে এই বিষয়ে ১৯৮২ সালে রণজিৎ গুহ ভারতবর্ষের প্রথম আলোক পাত করেন। রণজিৎ গুহ প্রথমে এগিয়ে আসলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিক এই বিষয়টি সমর্থন করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ড.গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী, সুসিত সরকার প্রমুখ।এই ইতিহাস চর্চার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রচলিত ইতিহাস চর্চায় সমাজের উচ্চবর্গের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত কিন্তু এই ইতিহাস চর্চায় নিম্নবর্গ অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক-জনতা আদিবাসী এবং সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষ ও মহিলা বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় আন্দোলনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ চেতনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। বাংলা সাহিত্যে সমাজ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের নানা চেহারা ধরা পড়েছে। এদের মধ্যে বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের চেতনা অন্য মাত্রা পেয়েছে। নিম্নবর্গীয় সমাজ চেতনা শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ,শরতচন্দ্র,মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,সতীনাথ ভাদুড়ির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সতীনাথ ভাদুড়ির ঢোঁড়াই চরিত মানস নিম্নবর্গ প্রধান উপন্যাস। নিম্নবর্গ মানুষের সমাজ, তাদের জীবনযাত্রা এখানে বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত। সতীনাথ ভাদুড়ী তার 'ঢোডাই চরিত মানস' উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে অন্য এক আবেদন নিয়ে পাঠকসমাজে হাজির হয়েছিলেন।উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে এক বিদ্রোহাত্মক চিন্তাভাবনার পরিচয় বহন করে,নিম্ন সমাজের মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধ বার্তা নিয়ে লেখা এই উপন্যাস।

সতীনাথ সাব-অল্টার্ন চেতনা এত সুন্দর ভাবে এত আন্তরিকতার সঙ্গে অসহায় দরিদ্র মানুষদের চেতনা তুলে ধরেছেন এর আগে তা আর কেউ করতে পারেনি। তিনি আশ্চর্য দক্ষতায় নিম্নবর্গের আবেদন, নিম্নবর্গের মানুষের ছোট ছোট কথা, ছোট-ছোট দুঃখ ব্যথাকে পরিপূর্ণ অবয়ব দিয়েছেন।গান্ধী ভাবাদর্শ কেমন করে বিহারের নিম্নবর্গীয় আশা-আকাঙ্ক্ষায় কামনা-বাসনায় দোলা দিয়েছিল কেমন করে তারা গান্ধীর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভাবনার সঙ্গে নিজেদের উচ্চবর্গীয় শোষণমুক্তির ভাবনায় যোগ দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত কেমন করে মহাত্মাজীর ব্রিটিশের শক্তি পরীক্ষার সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষার খেলায় মেতে ছিল তার সানুপঙখ বিবরণ আছে ইতিহাসে। কিন্তু যা ইতিহাসে নেই কিংবা তেমন করে নেই তা হল গান্ধী ভাবাদর্শ যা নিম্নবর্গীয় কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছিল তা নিম্নবর্গের মধ্যেই কেমন করে ভেঙে পড়ল তার বিবরণ। গান্ধীর ভাবাদর্শের বিস্ফোরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত একটি বাক্যে সংহত করা যায় তা হলো কংগ্রেসী আন্দোলনে নিজেদের সংযুক্ত করে নিম্নবর্গের আশা ভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু এই আশাভঙ্গের বেদনা এবং এই বেদনার অন্তর্দর্শী সংবেদনশীলতা এই সংবেদনশীলতা সংহত গভীর মর্মস্পর্শী অনুভব করতে ঢোডাই ছাড়া বিকল্প নেই। সেখানে সতীনাথ অসাধারণ সাহিত্যিক অসাধারণ ঐতিহাসিক।

মূকাভিনয় : নৈঃশব্দ যখন বাঙ্ময়

বর্ষা পণ্ডা

গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

কৃত্রিম আড়ম্বরপূর্ণ উচ্চরবের ভাষার কান-ফাটানো দৌরাত্ম্যে যখন মানুষ দিশেহারা, তখন মূকাভিনয়ের নিরাভরণ হার্দিক শারীর ভাষা দর্শকমনকে ছোঁবেই। মুখে শব্দ না করে বা সংলাপ ব্যবহার না করে শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা। নাট্যশিল্পের এক বিশেষ দিক হচ্ছে এই মূকাভিনয়। তাই অনুশীলনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে মূক নাটক তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য পৌঁছে দেবে দর্শকের মনে। আর মূকাভিনয়ের সর্বজনীনতা তো সর্বজনবিদিত।মূকাভিনয়ই একমাত্র প্রয়োগশিল্প যা দেশগত বা ভাষাগত ব্যবধান ঘুচিয়ে সকল দেশের মানুষের হৃদয় সংবেদ্য হতে পারে। মূকাভিনয় পারে শব্দের শৃঙ্খলাকে, চেনা প্রাত্যহিকতার শৃঙ্খলকে ভেঙে দিয়ে বাস্তবাতীতের সঙ্গে সেতু বাঁধতে। থিয়েটারকে যদি যৌথশিল্প হিসাবে ধরি, তাহলে আদিকাল থেকেই তার মধ্যে মূকাভিনয়ের একটা সম্মানজনক স্থান রয়েছে। সুতরাং সংলাপ উচ্চারণকারী কোন অভিনেতার থেকে নির্বাক অভিনেতা মোটেই কম ক্ষমতাশালী নন। মূকাভিনয়ও নয় কোন ব্রাত্য শিল্প মাধ্যম। প্রকৃত মূকাভিনেতা যখন নৈঃশব্দ্যকে বাঙ্ময় করে তোলেন, তখনই সম্ভবত শিল্পের অমরাবতীতে প্রবেশের দ্বার অর্গলমুক্ত হয়।

বাংলা উপন্যাসে বিশ শতকের চারের দশকে ভারত ও বঙ্গের রাজনীতি ও সমাজ

বানী রায়

গবেষক, সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি (বোলপুর)

একটি অঞ্চলে একটি বিশেষ সময়ের বাস্তব পরিমণ্ডলের প্রধানত তিনটি দিক থাকে। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক দিকের কথাও বলা যায়। আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ১৯৩০–১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বে উল্লিখিত চারটি দিক দেখানো।

ভারতীয় উপমহাদেশ তখন ছিল ব্রিটিশের শাসনাধীন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় দেশবাসীর একাংশ ক্রমশ সচতেন ও সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। বিশ শতকের প্রথম দশকে বিপ্লবী আন্দোলন মূলত দুটি ধারায় বিস্তার লাভ করে। একটি হল অহিংস আন্দোলন এবং অন্যটি হল সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। এই সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের মূল লক্ষ ছিল ব্রিটিশ শাসকগোষ্টির মনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে তাদের শাসনযন্ত্রকে বিকল করে দেওয়া। এই বিপ্লবী আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে কখনও পরিচিলত হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা 'অনুশীলন সমিতি'র নাম করতে পারি। সতীশচন্দ্র বসুর উদ্যোগে ১৯০২ খ্রি: মদন মিত্র লেনে এই সমিতির জন্ম। মাতৃভূমির বন্ধন মোচনই ছিল এর প্রধান লক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী'(১৮৮৪) উপন্যাসের 'অনুশীলন' তত্ত্বকেই এই বিপ্লবীরা আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই সমিতি তরুণ সদস্যদের ব্যায়াম চর্চা, লাঠিচালনা, মুষ্টিযুদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা এই সমিতিতে যোগ দিয়ে এর পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেন। ১৯০৭ খ্রি: বিপ্লবী কুমার ঘোষ ও তার সহযোগীদের উদ্যোগে গড়ে উঠে যুগান্তর দল। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে এই দলটির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

১৯৩০– ১৯৩৯ এই কাল পর্বে আমরা বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটতে দেখি। তার মধ্যে একটি প্রধান বিষয় হলো ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

এই কালপর্বে ভারতীয় রাজনীতিকে কংগ্রেসের আন্দোলন হয়ে উঠেছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় গান্ধীজির নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ অসহযোগ আন্দোলন এবং লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থাকে।

এই সময়ের বঙ্গীয় রাজনীতিতে বামপন্থী আন্দোলনের ও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। বিপ্লবী এম. এন. রায় এবং তার সহযোগী মুজাফফর আহমদ কলকাতায় বসে সমাজতন্ত্রবাদী ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে

লাগলেন মানুষের মনে। এই তৃতীয় দশকেই নজরুল লেখেন 'বিদ্রোহী', 'ধীবরদের গান', 'কুলীমজুর' ইত্যাদি কবিতা। নজরুলের নেতৃত্বে প্রকাশিত হয় 'লাঙ্গল' ও 'গণবাণী' পত্রিকা।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই ভারত ব্রিটিশ শাসকের অধীন। এই অত্যাচারী শাসক বাংলার কৃষকদের নীলচাষ করতে বাধ্য করে, বাংলার তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করে দেয়। অন্যদিকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে বাংলার অর্থনীতিতে দেখা দেয় তীব্র মন্দা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে বাংলার কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে দেখা দেয় অসন্তোষ। বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জগদীশগুপ্তের লেখায় এই দিকটি আমরা ফুটে উঠতে দেখি।

বিশ শতকের প্রারম্ভেই ফ্রয়েড, প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদের প্রভাব দেখা দেয় বাংলা সাহিত্যে। এছাড়াও বিশ শতকে যেসব যুবক উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যেতেন তাঁদের পাশ্চাত্য চিন্তাধারা প্রভাবিত করতে শুরু করে বাংলা লেখকদের। অন্নদাশঙ্কর রায় এবং দিলীপকুমার রায়ের উপন্যাসে ভারতীয় মানসিকতা ও মূল্যবোধের সঙ্গে পশ্চিমের সামাজিক বাতাবরণ ও চিন্তন-মননের সম্পর্কের জটিলতা তুলে ধরা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

বাপী মণ্ডল

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

উনিশ শতকে নারী কেন্দ্রিক আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর সামাজিক আন্দোলনের সুত্রপাত করেন। বিধবা বিবাহ আইন পাস হলে বহুবিবাহ সমাজে অভিশাপের মতো ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। বহুবিবাহ হিন্দু শাস্ত্রসম্মত নয়, সে বিষয়ে মতামত তুলে ধরেন। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর সঙ্গে সহমত শুধু হন নি, তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম কুটুক্তি করেন। সেকালের সংবাদ পত্রে বহুবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে তর্ক শুরু হয়। বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত দুটি গ্রন্থে বিরুদ্ধবাদীদের মতকে খণ্ডন করে সঠিক শস্ত্রীয় মত পোষণ করেন। এই আন্দোলন আইনি সহায়তা না পেলেও, পরবর্তীতে হিন্দু বিবাহ আইন গণতান্ত্রিক পরিসর পায়। সে পরিসর বর্তমানে সকলে ভোগ করছি। এই আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার বিদ্যাসাগর নতুন করে নিজের দৃঢ়তা প্রকাশ করেন।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ গল্প (নির্বাচিত) : জীবন-জীবিকায় প্রযুক্তির আগ্রাসন ও প্রভাব

বাপ্পী বর্মণ

গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞানের আশীর্বাদে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যন্ত্রমুখি হয়ে পড়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ কোনো না কোনো ভাবে যন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। এর ফলে একদিকে মানুষ যেমন প্রতিনিয়ত কাজ হারাচ্ছে নতুন নতুন যন্ত্রের চাপে অন্যদিকে মানবিকতা হারিয়ে যন্ত্রদাসে পরিনত হচ্ছে। বাস্তব সমাজজীবনে এরূপ অসংখ্য মানুষের জীবন- জীবিকার সংকট ও মানুষের যন্ত্রদাসে পরিণত হওয়ার ঘটনাকে স্বপ্নময় চক্রবর্তি তাঁর গল্পে তুলে এনেছেন সুচিত্রা, সাবিত্রী, কদম্ব, তারাদাস, খগা মণ্ডল ও গল্প কথকের মধ্যে দিয়ে।

আলিবাবা নাটকে গানের ভূমিকা

বিবেকানন্দ পাল

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' নাটকে ব্যবহৃত গানগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। বাংলা নাটকের ইতিহাসে এই গানগুলি অবশ্যই স্বাতন্ত্রতার দাবি রাখে। নাটকটিতে গীতিধর্মী- গীতিময় সংলাপের রেষ ধরে রাখতে গিয়ে নাট্যকার প্রায় সব সংলাপ গুলিকে গীতিধর্মী করে তুলেছেন। অর্থাৎ নাটকের সংলাপ ব্যতীত গান দিয়েই বক্তব্য অনেকখানি পরিস্ফুটিত হয়েছে। গানগুলিকে নাটকটিতে একটি অনন্য কাঠামোতে হাজির করা হয়েছে। সেকালে 'আলিবাবা' নাটকের গান মানুষের মুখে মুখে এতটাই ছড়িয়েপড়েছিল তা সমকালে নাটকটির জনপ্রিয়তা বহুলাংশে বাড়িয়েদিয়েছিল। অপেরাধর্মী এই নাটকটি প্রচলিত অপেরাধর্মী অন্যান্য নাটক থেকে অনেক বেশি জনপ্রিয় এবং তার অনেকটাই তার গানের সুবাদে। গানগুলি নাট্য ঘটনা কে পরিপূর্ণতা দানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মঞ্চে অভিনয়োপযোগী করার জন্য গান গুলির প্রয়োজন রয়েছে। যেখানে সংলাপ পথ হারিয়েছে, সেখানে গান আলোর দিশারী হয়েছে। নাটকে দৃশ্য থেকে দৃশ্যন্তরে সংলাপ ব্যতীত গান দিয়েই অনেকখানি বক্তব্যকে তুলেধরাহয়েছে। নাটকের প্রস্তাবনা, অঙ্কসজ্জা, climax, কৌতুকরস সৃষ্টি, রোমান্টিক কমেডি সৃষ্টিতে, বুভুক্ষু মানুষের অভিব্যক্তি

প্রকাশে, বিত্তশালী মানুষের আমোদ প্রকাশে, পট পরিবর্তনে গানগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। যাত্রার মতোই এই নাটকে এমনওগান পরিবেশিত হয়েছে যা বিবেকের গানের মত।এত বেশি সংখ্যক গান তাতে নাটকের গতি থেমে থাকে নি বরং নাট্যাবেগকে ত্বরান্বিত করেছে। নাট্যকার আরো বেশি প্রশংসিতহবেন এই কারনে যে, তার গানগুলিতে কোথাও কৃত্রিমতা নেই বরং যে চরিত্রের মুখে যে ভাষা পায় সেই ভাষাতেই গানগুলির প্রয়োগ হয়েছে। প্রায় সব গানে চূড়ান্ত স্বাভাবিকতার প্লটের সঙ্গে সংগতি রেখেই নাটকটি বিন্যস্ত হয়েছে। প্লটের গল্প রসের উৎকর্ষ সাধনে গানগুলিরঅনন্যতা বজায় রয়েছে। নাট্য সংগীতের এক ব্যাপক পরিধির উন্মোচন আলিবাবার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ তা সহজেই অনুমান করা যায়।ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের রচিত গানগুলি বিশ্লেষণে তাকে দক্ষ গীতিকার বলতে হয়। তার গানের বাণীতে কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এই প্রবন্ধের মূল দৃষ্টিভঙ্গি হল কীভাবে গানগুলি গল্পের বিকাশকে সফলভাবে উপস্থাপন করেছে এবং এই নাটকে নাটকীয় পরিস্থিতি প্রতিফলিত করেছেতা বিশ্লেষণ করা।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ নজরুল

বুবাই পিরি

অতিথি অধ্যাপক, মেদিনীপুর সিটি কলেজ

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে ধূমকেতুর মতো আকস্মিকভাবে নজরুলের আবির্ভূত হয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল। বিশের দশকে যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তুঙ্গে তখন তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর লেখনী বার বার গর্জে এর বিরুদ্ধে। তার প্রমান আমরা তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতা ও গানে পেয়ে থাকি। সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতায় তিনি একজন বলিষ্ঠ কান্ডারী।

বাঙালি-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক : একটি পর্যালোচনা

মকর মুর্মূ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কান্দি রাজ কলেজ, কান্দি, মুর্শিদাবাদ

পশ্চিমবঙ্গের বাংলায় বাঙালি আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতির সম্পর্ক অতি প্রাচীন। সেই আর্য-অনার্যের সময় থেকেই। বলা যায় সেই সময় থেকে যখন বাংলা ও বাঙালির পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করেনি। 'বঙ্গ' থেকে 'বাঙলা', আর বাংলা ভাষা থেকে বাঙালি ও আদিবাসী সাঁওতাল জাতির সম্পর্ক। আর দীর্ঘ সময়কালের ধারায় পাশাপাশি অবস্থানে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান হওয়াই স্বাভাবিক। এই মিশ্রসংস্কৃতির শুরু ভাষা দিয়ে। বাংলা ভাষা দিয়ে বাঙালি জাতির বিকাশ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক যুগে বটেই, প্রাচীন ও মধ্যযুগের রচনাতেও আদিবাসী অনুষঙ্গের কথাও স্মরণ করা যায়। পৃথিবীর যে কোন জাতির আচার আচারণ, সংস্কার বিশ্বাস, খাওয়া দাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি সামগ্রিক বিষয়, সর্বোপরি ভাষা ব্যবহারই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই একদিকে আদিবাসী সাঁওতাল জাতির সাথে বাঙালির মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলার অধিবাসী হওয়ার দরুন সমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি একটা আনুগত্য দেখা যায়। অন্যদিকে বাংলার প্রধান ভাষা বাংলা হওয়ায় অর্থনৈতিক ব্যাপারের জন্যও বাংলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হয়েছে। মোট কথা আদিবাসীরা মূলত দ্বি-ভাষিক। সামগ্রিকভাবে বাঙালি আদিবাসীর সাংস্কৃতিক ব্যাপক ও গভীর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বিষয়ে বাধ্য বাধকতা উভয় তরফ থেকেই দেখা যায়। কারণ সমাজ সংস্কৃতির ধর্মই হল পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনা, আবিষ্কার, সংযোজন, বিয়োজনের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী উপন্যাসে সমকালীন সমাজ ভাবনা

মনিকা মহাপাত্র

স্নাতকোত্তর পাঠ পর্যায় বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ কুতুরিয়া

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন জনপ্রিয় ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০০বঙ্গাব্দের ২৯শে ভাদ্র কাঁচরাপাড়া হালিশহরের নিকটবর্তী মুরারীপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। বিভূতিভূষণের জন্ম সালটিতে আবার চিহ্নিত সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের সাল হিসেবে। বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের সাথে সাথে সাহিত্যের যুগাবসান। এই যুগাবসানেই আর্বিভাব

বিভূতিভূষণের। তিনি রবীন্দ্রনাথ – শরৎচন্দ্র কিংবা জীবনানন্দের মতো নন,বরং তিনি আপন স্বাতন্ত্রে প্রোজ্জ্বল। বিভূতিভূষণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কিংবা জীবনানন্দের কথা আসতে বাধ্য কারন বিশেষ করে পদ্মাশ্রয়ী প্রকৃতি আর মানুষকে জড়িয়ে মিশিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পগুলি কিংবা জীবনানন্দের ছায়াঘেরা মায়াময় রূপসী বাংলার নদী–ঘাস-পাখি-হাঁস শঙ্খচিল–শালিকের অনুপম চিত্র রচনার প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ রুপমুগ্ধ মুক্তিপিয়াসী তারাপদ কে যখন দেখি তখন মনে পড়ে মহানন্দ তনয় বিভূতিভূষণের মানস লোকের কথা।

পিতার কাছে বিভূতিভূষণের পড়ালেখার পাঠ শুরু হয়। মাত্র ৫বেয়সে বাবার কাছে সংস্কৃত পাঠ ব্যকরন পাঠ শিখেছেন।এরপর তিনি নিজ গ্রামে এবং পরে বনগ্রাম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। কলকাতার রিপন কলেজে প্রথম বিভাগে আই.এএবং ডিস্টিংশন সহ বি.এপাশ করেন। হুগলি জেলার দ্বারকানাথ জাঙ্গীপাড়া হাইস্কুলে পরে সোনারপুর হরিনাভী স্কুলে শিক্ষকতা করেন।গ্রাম্য,গ্রাম্য পরিবেশ,গ্রামের মানুষদের নিয়েই ছিল তাঁর সাহিত্য রচনা।

বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী ও অপরাজিত বেশি পরিচিত উপন্যাস। পথের পাঁচালী বিভূতিভূষণের প্রথম এবং সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা। পথের পাঁচালী উপন্যাসে তাঁর ব্যাক্তিগত জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। পথের পাঁচালী উপন্যাসটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা এবং ইংরেজি ও ফরাসি সহ বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

নবারুণ ভট্টাচার্যের গল্পে অবক্ষয়িত সময় ও সমাজের চিত্র : নির্বাচিত দুটি গল্প অবলম্বনে

মনিরা খাতুন

এম.ফিল গবেষক, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

নবারুণ ভট্টাচার্য (১৯৪৮-২০১৪) এমন একজন লেখক যাঁর রচনার কোন পূর্বসূরী নেই। এখনও পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য ধারার কোন উত্তরসূরী চোখে পড়ে না। তিনি ষাট-সত্তরের দশকেরএক প্রতিষ্ঠান বিরোধী লেখক। লেখা তাঁর কাছে চিন্তার উপাদান, চিন্তার ফসল—যে চিন্তা গঠনমুলক, বিনোদনী নয়। তাঁর লেখায় লুকিয়ে থাকে এক বিস্ফোরক পদার্থ—যা চিন্তার অচলায়তনকে ভেঙ্গে দিয়ে বইয়ে দেয় চেতনার নতুন স্রোতধারা। লেখাকে তিনি সময় কাটানোর পন্থা হিসাবে দেখেননি, এটা একটা সমর প্রাঙ্গন। যেখানে তাঁর কাজ পাঠককে জাগ্রত করা, সচেতন করা। তাই বলা যায়, সত্তরের দশকের অগ্নিগর্ভ পরিবেশ থেকে রূপকথার ফিনিক্স পাখির মতো যেসকল ভিন্নধর্মী লেখক উঠে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম নবারুণ

ভট্টাচার্য।তাঁর গল্পগুলিতে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে যে সময়ের দোলাচলতা, তা মূলত সত্তর ও তার পরবর্তী দুই দশকের। চারিদিকে আতঙ্ক-অন্তর্ঘাত-সংঘর্ষ-অস্থিরতা-হল্লা। আকাশে বাতাসে সমাজ বদলের শ্লোগান। তারই সঙ্গে বারুদের গন্ধ, গুলির শব্দ, পুলিশের ভারী বুটের শব্দ। এমনই পোড়া ঝলসানো সময়, ক্ষয়ে যাওয়া সমাজ উঠে এসেছে 'ভাসান' ও 'অন্ধ বেড়াল' গল্পে।

নবারুণের প্রথম গল্প 'ভাসান' রচিত হয়েছে সাধু গদ্যে, একজন মৃত মানুষের জবানিতে। নবারুণের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বাসহন্তা সময় ও সমাজকে তুলে ধরা। তাই এই গল্পের সূচনা থেকে সমাপ্তির প্রতিটি বাঁক বদলে ধরা পড়েছে সেই অবক্ষয়িত সময় ও সমাজ। কাহিনীর শুরুতেদেবী দুর্গার বিজয়া দশমীর যাত্রা, পাগলির পাগলের মৃতদেহকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা, পাগলের পাগলিকে ভালো না বাসা এই সবকিছুর মধ্যেসে সময়ের কোলাহলতা, পুলিশি তান্ডব, গনতান্ত্রিক অত্যাচার ধরা পড়েছে।এছাড়া কথকের স্মৃতিতে ভেসে ওঠা এক শীতের রাত্রে দুটি লোকের পোঁটলায় বাঁধা একটি শিশুকে পার্কে ফেলে দিয়ে যাওয়া এই খন্ডচিত্রের মধ্যে একদিকে সমাজের উচ্চবৃত্তের স্বেচ্ছাচারিতা অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মনুষ্যত্ব বোধ, মানবিক প্রবৃত্তির সচলতার চিত্র ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ ষাট ও সত্তরের দশকে সমাজে যে ভাঙন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বপুঁজিবাদের যে দীর্ঘায়ত ছায়া পড়েছিল তারই ফলস্বরূপ ব্যক্তিগতও সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসে যে তীব্র ও জটিল অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, সর্বব্যাপ্ত সংশয় দেখা গিয়েছিল তারই ভাষ্যরুপ 'ভাসান' গল্পটি।

সময়ের চূড়ান্ত ক্ষয় আর ভাঙনের চিত্র দেখাতে গিয়েমানুষের পাশাপাশি কুকুর, বেড়াল পর্যন্ত উঠে এসেছে নবারুণের আখ্যানে। তেমনি একটি গল্প হল 'অন্ধবেড়াল'। তবে এটি একটি অন্ধ বেড়ালের গল্প হলেও গল্পের কাহিনী বুননে লেখক তুলে ধরেছেন সমাজ ও সময়ের দোলাচলতাকে। অন্ধ বেড়াল এবং সে যে হোটেলে থাকে সেই হোটেলটি প্রতীকি মাত্রা অর্জন করেছে। হোটেল তৎকালীন দেশ বা রাজ্যের অবস্থানকে প্রতীকায়িত করে আর অন্ধ বেড়াল হয়ে উঠেছে জন সাধারণের প্রতিনিধি।হোটেলটি দেশ বা রাজ্যের প্রতীক হবার পাশাপাশি হোটেল মালিক হয়ে উঠেছে দেশের শাসক দলের প্রতিনিধি।হোটেলের কাঠামো বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে ষাট ও সত্তরের দশকের মুখ থুবড়ে পড়া দেশের আর্থসামাজিক কাঠামো। এই গল্পে একটি বিধবা মেয়ে তার দুটো বাচ্ছা নিয়ে হোটেলে কাজ করার প্রসঙ্গেগনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অসহায় জনগনের প্রতি শাসকের উদাসীনতা প্রকট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াহোটেলে নানা ধরনের মানুষের সমাগম, নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা,ক্ষমতার শিখরে পৌঁছে শাসক কীভাবে ভুলে যায় জনগনকে তা ধরা পড়েছে। ।বাঁধ বাঁধার উপরে একটা ওয়ার্কশপে আসা মানুষজন'হেল্পলেস ক্যাট'কে শেল্টার দেওয়ার জন্য হোটেল মালিকের প্রশংসা করার প্রসঙ্গে দেশের অতিথির কাছে কীভাবে প্রকাশ পায়শাসকের জনদরদী রূপ তা তুলে ধরেছেন লেখক। সব মিলিয়ে বলা যায়অপ্রত্যাশিত রূঢ়তা, নিষ্ঠুরতা, মৃত্যুর মিছিল যা ছিল সমকালীন জীবনের সঙ্গী, তা-ই অন্ধ বেড়ালের প্রতীকে নবারুণের আখ্যানে প্রকাশ পেয়েছে এবং তাঁর গদ্যভাষ্যে ফুটে উঠেছে উপভোক্তা সংস্কৃতি ও আধিপত্যবাদেরপ্রতি প্রতিবাদের কণ্ঠ।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন গড়ে তুলেছিল দেশবাসী, নবারুণ তা দেখেন নি। তিনি দেখেছেন স্বপ্নের ভাঙা টুকরোয় লেগে থাকা মনের রক্তক্ষরণ, দেশভাগের দগ্‌দগে ঘা আর দাঙ্গায় বিষিয়ে ওঠা ক্ষত। ফলে তাঁর মধ্যে সঞ্চিত হয়েছিল ক্রোধ, ক্ষোভ। তাই রাষ্ট্রীয় শোষণ এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধরলেন প্রতিবাদী অস্ত্র। নিজস্ব মত এবং মননকে প্রকাশ করলেন প্রতিবাদীকলমের আঁচড়ে। প্রকাশ্য ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। আর এই প্রতিবাদেরভাষাকে তিনি যথাসম্ভব কথ্য ভাষার অনুসারী করে তুললেন। তাঁর লেখায় ব্যবহৃত হয় প্রচুর অপশব্দ। প্রতিটি চরিত্র সমাজের এমন সব কোন থেকে তুলে আনা যা অভাবনীয়। এখানেই নবারুণ স্বতন্ত্র্য। নিজস্ব শৈল্পিক আকল্পে যে ভাস্বর স্বাক্ষর রেখেছেন নবারুণ তা তাঁকে অনন্য করে তুলেছে।

নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকায়ত জীবন ও জীবিকা

মনিহার খাতুন

পিএইচ. ডি. গবেষক, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশিষ্ট জেলা। এই জেলার দক্ষিণে রয়েছে বিশিষ্ট ম্যানগ্রোভ অরণ্য-সুন্দরবন। বাঘ, সাপ ও অন্যান্য হিংস্র বন্যজন্তুতে পরিপূর্ণ ঘন জমাট বাঁধা সমুদ্রোপকূলীয় অরণ্য। এই অরণ্যাঞ্চলে বাস করে যে হতভাগ্য মানুষগুলো, তাদের জীবন ভয়ানক বিপদসঙ্কুল। জল ও জঙ্গলের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় তাদের। এই অরণ্যাঞ্চলের বাইরে রয়েছে আরো এক বিস্তৃত ভূখণ্ড, যেখানে অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, ভয়ানক দরিদ্র। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এদের কেউ কেউ কৃষিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ব্যবসা বানিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। কেউ বা চাকরির সুবাদে সামান্য স্বচ্ছল। এই জেলায় শহর ও আধাশহর আছে কয়েকটি। সেখানে তথাকথিত উন্নত, শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস। ইতিহাস কথিত শৌর্যবান গঙ্গারিডি জাতির একদা অবস্থান ছিল এই দক্ষিণবঙ্গেই-সাগর সন্নিহিত জনপদে। সে জাতি আজ খাতায় কলমে নিশ্চিহ্ন। কিন্তু তাদের রক্তধারা আজও নিঃশব্দে বহমান এখানকার ভূমিপুত্রদের দেহে-মজ্জায়-শোণিতে। বস্তুত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিশিষ্ট ভূ প্রকৃতি, জলবায়ু, জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও তাদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার এখানকার লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিকে পৃথক পরিচয় দান করেছে - যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন। মধ্যযুগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রকৃতি, মানুষ ও লৌকিক দেবদেবীদের কথা নিয়ে রচিত হয়েছে 'রায়মঙ্গল',

'বোনবিবি জুহুরা নামা'– র মত সাহিত্য। আধুনিক কালের সাহিত্যে প্রথম দিকে এই জেলা ছিলো একেবারেই ব্রাত্য। অনেককাল পরে মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী কালে কবি-সাহিত্যিকদের কলমে ধীরে ধীরে বিস্তৃত আকারে উঠে আসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রসঙ্গ। মনোজ বসু, শিবশঙ্কর মিত্ররা দিলেন এই পথের সন্ধান। তারপর থেকে শক্তিপদ রাজগুরু, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, আব্দুল জব্বর, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন দাস প্রমুখ লেখকগণ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাকে তাঁদের লেখার উপজীব্য করে বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় দরবারে এক চিরস্থায়ী মর্যাদা দান করেছেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের যথার্থ সূচনা ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর হাতে। এই জেলার অখণ্ড বাদা অঞ্চলের অসামান্য রূপকার তিনি। বনাঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে অগ্রজ এই লেখকের ভাবনা ধরা পড়েছে তাঁর 'জলজঙ্গল' (১৯৫১) ও 'বন কেটে বসত' (১৯৬১) উপন্যাসে। উপন্যাস দুটি সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের সংগ্রামী মানুষের বৃত্তিকেন্দ্রিক জীবন যাপনের বিশ্বস্ত দলিল।

সুন্দরবনের সংগ্রামী জীবনের আর এক দক্ষ রূপকার শিবশঙ্কর মিত্র। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তথা সুন্দরবনের পটভূমিতে লেখা তাঁর পাঁচটি উপন্যাস- 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' (১৯৫৫), 'সুন্দরবন' (১৯৬২), 'বনবিবি' (১৯৬৬), 'রয়ালবেঙ্গলের আত্মকথা' (১৯৮৩), 'বেদে বাউলে' (১৯৮৫)। 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' উপন্যাসটি লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। সুন্দরবনের দুধর্ষ শিকারী আর্জানের সংগ্রামী জীবনযাত্রার কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত। সুন্দরবনের জনজীবনের ছবি অসাধারণ ভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর 'সুন্দরবন' ও 'বনবিবি' উপন্যাসে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গোসাবা, রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়া, প্রভৃতি অঞ্চলের জনজীবনের সুন্দর চিত্রায়ন ঘটেছে তাঁর 'বেদেবাউলে' উপন্যাসে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের আর এক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব শক্তিপদ রাজগুরু। তাঁর 'নোনাগাঙ'(১৯৬৩), 'নয়াবসত'(১৩৭৮), 'খলসেমারির গঞ্জ'(১৯৯৭), 'অধিকার' (১৯৮৪), প্রভৃতি উপন্যাসে আছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রান্তবাসী মানুষের লোকায়ত জীবনের কথা। সুন্দরবনের শোষিত বঞ্চিত জেলে জীবনের চেহারা তাঁর হাতে শিল্পরূপ পেয়েছে। বাদা অঞ্চলের আর এক রূপকার বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর 'বনবিবি উপাখ্যান'(১৯৭৮) উপন্যাসে আছে সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল ও জনপদ তৈরির কাহিনী। তাঁর অপর একটি উপন্যাস 'বাগদা'(১৯৮৯) সুন্দরবনের জলকরের পটভূমিতে লেখা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকায়ত জীবনের ছবি চিত্রিত হয়েছে আব্দুল জব্বরের 'ইলিশ মারির চর' (১৩৬৮) উপন্যাসে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজ-সন্তোষপুর-মেটিয়াব্রুজ থেকে ফলতা রায়চক-ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণ বাংলার জেলেদের জীবন সংগ্রাম অসাধারণ ভাবে উঠে এসেছে উপন্যাসে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলকে সাহিত্যে উপজীব্য করেছেন এই জেলার কথা সাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। এই জেলার প্রেক্ষাপটে তিনি রচনা করেছেন 'বন্দর'(১৯৯২), 'রামপদর

অশনব্যসন'(১৯৯৩), 'স্বজন ভূমি'(১৯৯৪), 'চরপূর্ণিমা'(১৯৯৫), 'পূবের মেঘ দক্ষিণের আকাশ'(১৯৯৮), 'ফুলের মানুষ'(২০০০), 'সহিস'(২০০৭), 'সমুদ্র দুয়ার'(২০১০) প্রভৃতি উপন্যাস। ডায়মন্ডহারবার, কুল্পী, কাকদ্বীপ, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর, ফলতা, নৈনান, নুরপুর, নামখানা, সাগর, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকায়ত জীবন, জীবিকা, মানুষের প্রাত্যহিক বেঁচে থাকার সামাজিক ইতিহাসের আলেখ্য নির্মাণ করেছেন তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতা, নৈনান অঞ্চলে নদীতীরে অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার সরকারী প্রকল্প গ্রহণের সাথে সাথে সেখানকার মানুষের জীবন, জমি ও নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত দ্রুত বদলে যায় তা নিয়ে লেখা উপন্যাস 'বন্দর'। নদী মধ্যবর্তী দ্বীপ বা চরজীবনকে কেন্দ্র করে লেখা তাঁর 'রামপদর অশন ব্যসন' ও 'চরপূর্ণিমা' উপন্যাস। নোনাজল আর জঙ্গলের দেশে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে লেখা তাঁর 'স্বজনভূমি' উপন্যাস। সেই দৈনন্দিন বাঁচার গরীয়ান কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস। তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতেই লেখা শিশির দাসের 'শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা'(১৯৫৯)। তেভাগা আন্দোলনের সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত কুড়ি বছরের ভয়ঙ্কর কালের অবিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের প্রথম তথ্যনিষ্ঠ দলিল এই উপন্যাস।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পটভূমিকায় লেখা এখনো পর্যন্ত সর্ববৃহৎ মহাকাব্যোপম উপন্যাস বোধহয় তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নদী মাটি অরণ্য'। স্বতন্ত্র তিনটি পর্বে (১ম পর্ব ১৯৯৮, ২য় পর্ব ১৯৯৯, ৩য় পর্ব ২০০১), সাতকান্ডে বৃহদায়তন এই উপন্যাসে সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল, আবাদ পত্তন থেকে ভূমি আন্দোলনের প্রায় একশ বছরের ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে 'রামায়ণ' মহাকাব্যের পটভূমিকায়।

আলোচিত উপন্যাসগুলি ছাড়াও বাংলা সাহিত্য জগতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জীবন-জীবিকা কেন্দ্রিক বহু উপন্যাস। যেমন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদ নদী সবুজ বন'(১৩৬২), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জলজঙ্গলের কাব্য'(১৯৮০), সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ'(১৯৮০), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা'(১৯৯৬) ও 'কুবেরের বিষয় আশয়'(১৯৬৭), শচীন দাশের 'জল জঙ্গলের রয়ানি' (২০১৩), 'অন্ধনদীর উপখ্যান' (২০০৪) ইত্যাদি। ইদানিংকালে যে সব ঔপন্যাসিক দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ভিত্তিক উপন্যাস লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম উৎপলেন্দু মন্ডল, ভাগ্যধর বারিক, পঞ্চানন দাশ, প্রদীপ বর্মন প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই এই জেলার ভূমিপুত্র। পশ্চিমবঙ্গের অখ্যাত এক অঞ্চলের সন্তান হিসাবে, সেখানকার মানুষ, তাদের জীবিকা, জীবন সংগ্রাম, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ছবি বৃহৎ জগতের সামনে তুলে ধরার যে দায়বদ্ধতা তাঁরা স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তার ভার আজও বহন করে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অধ্যাত্মভাবনা

মন্দিরা দে

গবেষক, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

উনিশ শতকে বাঙালি জীবনে সংস্কৃতি সংকট দেখা দিলে বাঙালি মনীষীরা অতীত ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণে জাতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন এবং ভাবজীবনে আস্থা স্থাপনের কথা বলেছিলেন। রামমোহন থেকে শুরু করে অনেকেই ভারতীয় ঐতিহ্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সেই উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর জীবন ও সাহিত্য-সাধনায় ভারত-ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপ গড়ে তুলতে সার্থক প্রচেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষত রবীন্দ্রকাব্যে জীবন ও অধ্যাত্মের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মকেন্দ্রিক নয়; তা তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি। কবির ধর্মচেতনার মূল ভিত্তি নিত্য শাশ্বত মানবধর্ম আর কবির ঐশীচেতনা তাঁর ধ্যানলব্ধ, হৃদয়-রসে জারিত। উদারতা, মানবপ্রীতি, বিশ্বাত্মবোধ, অরূপের সাধনা, অতীন্দ্রিয় ভাবব্যাকুলতা, আনন্দোপলব্ধি — রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনাকে পরিপুষ্টি দান করেছে। কবির প্রত্যয় ছিল, এই ঐশী প্রেরণা মানবকে ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায়। কবির অধ্যাত্মভাবনায় সৃষ্টি সত্য, জীবন সত্য, মানব সত্য — দুঃখ আর ত্যাগের মূল্যেই মানবের আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে — প্রেম ও কল্যাণকর্মের প্রেরণা মানবকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর করে। রবীন্দ্রকাব্যে কবির সত্যদর্শন, আত্মোপলব্ধি শিল্পসংগত রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনার প্রেক্ষাপটে ক্রিয়াশীল ছিল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-শাস্ত্র-দর্শন। যে মিলনের সাধনা, আত্মার উপাসনা ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে, তা-ই রবীন্দ্রমননে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতীয় পুরাণের রূপ ও অরূপ, নিত্য ও অনিত্য, সীমা ও অসীম, বিশেষ ও নির্বিশেষ কবিশিল্পীর হৃদয়রসে জারিত হয়ে এক অপূর্ব মধুর অধ্যাত্মবাদ নির্মিত হয়েছে রবীন্দ্রকাব্যে। ‘পালাবদলে’র পরম্পরায় কবিজীবনে অধ্যাত্মভাবনার ক্রমবিকাশ স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়।

রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩) : এক ধর্মনিষ্ঠ যুক্তিবাদী সংস্কারক

ড. মিঠু জানা

সহকারী অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, হিজলী কলেজ

ধর্মীয় গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে যিনি যুক্তিবোধকে হাতিয়ার করে প্রবল প্রতিবাদী হয়েছিলেন—তিনি রামমোহন রায়। চিন্তা আর প্রয়োজনীয়তার নিরিখে তিনি যেমন ধর্মকে বিচার করলেন, তেমনই শাস্ত্রবিধির জাঁতাকলে আবদ্ধ সমাজকে দিলেন মুক্তচিন্তার মহামন্ত্র। আসলে তিনি অচিরেই বিভিন্ন ভাষাচর্চার সূত্রে হিন্দুশাস্ত্র ও মুসলমানশাস্ত্র বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছিলেন। অতঃপর মুসলমানী, হিন্দু ও ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতায় পাকাপাকিভাবে বসবাস করেন এবং এক নতুন জগতের সন্ধান পান।

বলাবাহুল্য ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত যুক্তিবাদী। ধর্মের চেয়ে মানুষের কল্যাণই ছিল তাঁর প্রধান ব্রত। তাই সতীদাহের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের উপেক্ষা করে যেমন প্রতিবাদস্বরূপ পুস্তিকা রচনা করেন,তেমনই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য নিজ ব্যয়ে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপন করেন। এই ব্যাপারে লর্ড আমহার্স্টকে পত্র লেখার পাশাপাশি পাদ্রী ডাফের স্কুলের জন্য ব্রাহ্মসভা'র একটি ঘর ভাড়ায় দেওয়া ছাড়াও ছাত্র সংগ্রহেও নিজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এমনকি আমাদের দেশীয় কৌলিন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ কিংবা জাতিভেদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে লেখনী চালনা করেছিলেন।

রামমোহনের কাছে ধর্ম মানে ছিল ঈশ্বরের উপাসনা ও মানুষের কল্যাণসাধন। তিনি পৌত্তলিকতারও ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাচার ছাড়াও মুসলমান শাস্ত্রপাঠে একেশ্বরবাদের কথাও বলেন। তবে খ্রিষ্টানধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। একটি পুস্তিকায় খ্রীষ্টধর্মের উক্তি-সংগ্রহ প্রকাশ করে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন পর্যন্ত হয়েছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্মের একত্ববাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি'ও স্থাপন করেন।

তাই বলে তিনি কোনোদিনই ব্রাহ্মণ্যসংস্কার বর্জন করতে পারেননি। বেদবেদান্তের সার 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' প্রকাশ করেন। এমনকি ব্রহ্মসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৮-এর ২০ আগস্ট 'ব্রাহ্মসভা' স্থাপন করেন। যে সভায় হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান—সকল সম্প্রদায়ের মানুষই উপাসনা করতে পারতেন। আসলে তিনি মানবধর্মানুশীলনের পক্ষে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্রহ্মোপাসনার উপদেশাবলীর প্রচার করতে চেয়েছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি যে বিশ্বজনীনতা ও অসাম্প্রদায়িকতা—তাই ছিল রামমোহনের ধর্মানুশীলনের দৃঢ় ভিত্তিভূমি। তবে তাঁর এই ধর্মমত কোনো নতুন ধর্মমত নয়—বরং তৎকাল প্রচলিত হিন্দুধর্মের বহুকাল সঞ্চিত আবর্জনা দূর করে ব্রহ্মবাদকে যুগোপযোগী করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই বোধহয় দেশীয় বৈষ্ণব ধর্মাচারকে সমালোচনা করেছেন অনায়াসে।

আসলে কোনো ধর্মকেই তিনি অভ্রান্ত মানতেন না। প্রত্যেক ধর্মেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে--এ বিশ্বাসে তিনি ছিলেন অবিচল। এমনকি প্রত্যেক ধর্মের প্রতিই তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীলও। তাই অসাধারণ মনীষা ও দক্ষতায় ধর্মরাজ্যে একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপনে তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই তিনি শুধু যুক্তিবাদী ও ব্যতিক্রমী সংস্কারকই নন—ভারচেতনার এক অবিসংবাদিত পৌরুষ।

বিহারীলালের 'বঙ্গে বর্গী' : একটি পর্যালোচনা

মৃণাল কান্তি রায়

গবেষক, এম.ফিল, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

আঠারো শতক বাংলা তথা ভারত ইতিহাসের এক ঝঞ্ঝামুখর সময়। দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্য তখন প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। প্রাদেশিক বিভিন্ন শাসনকর্তারা কেন্দ্রীয় মুঘল শক্তির দুর্বলতার সুযোগে নিজেদের শক্তিশালী করে বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল। রাজনৈতিক নানা টানাপোড়েন, অনিশ্চয়তার কালো মেঘ এইসময় জনজীবনকে সর্বক্ষেত্রে নিম্নগামী করে তুলেছিল। সাহিত্যসংস্কৃতি-সমাজ-, ধর্মঅর্থনীতি-রাজনীতি- সাধারণ জনজীবনে সর্বক্ষেত্রেই অবক্ষয় ও আত্মবিস্মৃতি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। যে কোনো বিষয়ে উন্নতি হওয়ার প্রাক্‌মুহূর্তে অন্ধকার, হতাশা ক্রমশ গ্রাস করে ফেলে, অনেকটা কৃষ্ণবিবরের মতো; বাংলার তথা ভারতীয় নবজাগরণের ঢেউ আসার পূর্ব মুহূর্তে ঠিক ওই ঘটনাই ঘটেছিল। সে সময়ে জনজীবনের সবদিক থেকে অধঃপতন দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন লোকাচার, অন্ধবিশ্বাসের পঙ্কিলতায় জীর্ণমলিন হয়ে পড়েছিল সমাজ। -প্রত্যয় সেদিনের মানুষ অনুভব করতে পারেনি। মধ্যযুগীয় লোকাচার ও পাশ্চাত্যের আলোকদীপ্ত উচ্চাশার সংস্কারের সম্পূর্ণ নিমজ্জিত ছিল মানুষ।

এই আঠারো শতকে দিল্লি তথা বাংলার সিংহাসনে যাঁরাই আসীন হয়েছিল তাঁরা অগ্নিশিখাসম যুদ্ধাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছেন। এই সময়ে আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্শত্রুর আঘাত সাধারণ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। বাংলায় তখন নবাবী শাসন চলছে। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁ'কে হত্যা করে চতুর আলিবর্দী খাঁ নবাব হয়ে বসলেন। সিংহাসনে বসেই তিনি যৎসামান্য উপঢৌকন দিল্লীতে পাঠিয়ে, রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ রেখে বাংলায় স্বাধীনভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। ফলে বাংলা থেকে যে রাজস্ব একসময় দিল্লীতে যেত এবং সেখান থেকে মারাঠারা তাদের চৌথের ভাগ পেত, সেই ভাগ থেকে তারা বঞ্চিত হল। অতঃপর মারাঠারা বাংলার চৌথ নিজেরাই ছিনিয়ে নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরীহ মানুষদের আস্তানায়। এবং বাংলার মানুষ নয় নয়টি বছর যারপরনাই অত্যাচার সয়ে গেল। বাঙালিরা মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যদের 'বর্গী' আখ্যা দিয়েছিল; এবং মারাঠাদের এই বাংলাদেশ আক্রমণ

'বর্গীর হাঙ্গামা' বা 'বর্গীর আক্রমণ' নামে পরিচিত। মারাঠারা চৌথ আদায় করতে এলেও নিজেদের স্বভাব ভুলতে পারেনি। তাঁরা বাংলাদেশের মানুষকে চরম দুর্ভোগে ফেলে হাত-পা কেটে বাড়িঘর জ্বালিয়ে-, নারী ধর্ষণ করে, ক্ষেতখামার পুড়িয়ে এক রুদ্ধশ্বাস- পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাঁদের বিধ্বংসী আক্রমণে গ্রামাঞ্চল, শস্যক্ষেত্র শুন-শান শ্মশানে পরিণত হয়। আজও বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে সেই বিভীষিকার কথা মিথের ন্যায় মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। নেপোলিয়নের সময় ইংল্যান্ডবাসী যেমন নেপোলিয়নের নাম করে দুষ্টু শিশুদের ঘুম পাড়াত, বাংলাদেশে আজও বাঙালি মায়েরা বর্গীদের নাম করে দুষ্টু শিশুদের ঘুম পাড়ানি গান শোনায় – 'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়লো বর্গী এলো দেশে।' যার মধ্যে দিয়ে নারী হৃদয়ের হাহাকার, ভয় এবং আশঙ্কার চিত্রটি ফুটে উঠেছে। বিহারীলালের 'বঙ্গে বর্গী' গ্রন্থ ঐ সময়ের ঐতিহাসিক দলিলস্বরূপ।

সমরেশ বসু 'টানা পোড়েন' উপন্যাসের পেশাগত সমাজভাষিক আলোচনা

ড. যমুনা ধাড়া

সহকারী অধ্যাপক, অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়

সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস আধুনিক সময়ের। এই বিদ্যা আলোচনা করে মূলত ভাষা ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ককে নিয়ে। ভাষীর সামাজিক শ্রেণি, অবস্থান, পেশা, লিঙ্গ, ধর্ম অনুযায়ী ভাষা পার্থক্য তৈরি হয়। একজন নিম্নশ্রেণির ভাষী যেভাবে কথা বলে, একজন উচ্চশ্রেণির ভাষী একই ভাষায় কথা বলে না। নারী-পুরুষের ভাষার মধ্যেও ভাষা-পার্থক্য লক্ষ করা যায়। একই ভাবে বিভিন্ন প্রেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ তাদের কাজের সূত্রে ব্যবহার করে নিজের নিজের পেশাগত বুলিকে। উপন্যাসের মধ্যেও ভাষার এই বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। সমরেশ বসুর 'টানা পোড়েন' উপন্যাসে দেখতে পাই বালুচরি শাড়ি বোনার সঙ্গে যুক্ত বিষ্ণুপুরের তাঁত শিল্পীদের নিজস্ব পেশাগত সামাজিক বুলিকে। এই উপন্যাসে লেখক ব্যবহার করেছেন এমনই বেশ কতকগুলি পেশাগত বুলি বা সমাজ-উপভাষাকে।

মহাভারতের নবনির্মাণ : প্রথম পার্থ ও নাথবতী অনাথবৎ

রঞ্জিত আদক

SACT - 1, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (অটোনোমাস)

বাংলা নাটকে পুরাণ এসেছে নাটকের উদ্ভবলগ্ন থেকেই। তবে সে সময় পুরাণ ব্যবহার হয়েছে ভক্তিবাদের আড়ালে। রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে আবারও পুরাণ এসেছে নাটকে বহুমাত্রায়। এ সময়ের বেশকিছু নাট্যকার পুরাণের পুনর্জন্ম দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু ও শাঁওলী মিত্র সেদিক থেকে অগ্রগণ্য। উভয়েই ভারতবর্ষের চিরপ্রসিদ্ধ পুরাণ– মহাভারতের কাহিনিকে অবলম্বন করেছেন এবং তাদের নতুন করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যুক্তির সাহায্যে। সেরকমই দুটি নাটক ‘প্রথম পার্থ’ ও ‘নাথবতী অনাথবৎ’।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা

রফিকুল ইসলাম খান

ছাত্র, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ

কুতুরিয়া, ভাদুতলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

“কে তুমি পড়িছ বসে কবিতাখানি
কৌতুহল ভরে।”

(রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃ-১১০)

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা ছিল অনন্য। অনন্য ঔপনিবেশিক পেক্ষাপটে তিনি মনে করতেন ভারতে ব্রিটিশরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল কেরানিকুল তৈরি করা; কিন্তু আমাদের সমাজের জন্য তখন প্রয়োজন ছিল মানবিক শিক্ষার। তিনি সেই সময় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ‘কেরানিগিরির কল’ আখ্যা দিয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন। এ বিদ্যা মানুষকে সৃজনশীল করে না। এতে প্রানের কোনো গৌরব নেই। ইংরেজরা নিজেদের দেশে এরকমই মানুষ তৈরির শিক্ষা চালু করে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রবাশে সে প্রক্রিয়া ঠিকই ধরতে পেরেছিল। উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ তরুন বয়সে প্রায় খানিক ইংল্যান্ডে ছিলেন পড়াশোনার জন্য। রবীন্দ্রনাথ সে সময় শিক্ষা নিয়ে ভাবছিলেন কিন্তু তখনও পন্য বিকিকিনির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেনি। তবে সে রকম প্রবনতা স্পষ্ট হয়েছিল। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরনের

বিপদ সমন্ধে রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা, শক্তি, স্বাধীনতা আর নৈতিক যোগাযোগ এই চারটি শব্দের মধ্য দিয়ে মানুষ সৃজনী শিক্ষা অর্জন করে বিশ্বজগতের মাঝে স্থান করে নিতে পারে।

সর্বোপরি বলা চলে যেহেতু তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র তাই তার চিন্তা-চেতনা ও দৃঢ়দৃষ্টি সমগ্র জগতকে প্রভাবিত করেছে। এবং তার শিক্ষাভাবনা সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করেছে। আর সেই দিন থেকেই বলতে হয়,-

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে।
তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।।
দেশের মৃত্তিকা থেকে নিল যারে হরি।
দেশের হৃদয়ে তাকে রাখিয়াছে ধরি।"

(রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃ-১২)

অনিল ঘড়াই-এর ছোটগল্পে অন্ত্যজ মানুষের রাজনৈতিক জীবনের স্বরূপ ও বিবর্তন : নির্বাচিত গল্পের আলোকে

রবীন্দ্রনাথ মুদি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
গড়বেতা কলেজ, গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে অনিল ঘড়াই এক ব্যতিক্রমী শিল্পী। প্রখর বাস্তববাদী এই শিল্পীর উপন্যাস এবং ছোটগল্পে অন্ত্যজ মানুষের জীবনচিত্র সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সাহিত্য যুগ ও কালের কথা বলে, সমাজের কথা বলে। সেই যুগ ও কালের সীমারেখা দিয়ে বিচার করলে অনিল ঘড়াই-এর কিছু ছোটগল্পে রাজনীতি প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায়। অনিল ঘড়াই যখন ছোটগল্প লিখতে শুরু করেছেন তখন স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের পালাবদল ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে তখন বামফ্রন্ট সরকার। অনিল ঘড়াই নিজে একজন পরিপূর্ণভাবে মার্কসবাদে বিশ্বাসী কথাকার। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। কলেজে পড়ার সময় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। প্রখর বাস্তববাদী এই লেখকের গল্পে তাই মানবতাবাদ, বিপ্লব চেতনা এবং মানুষের প্রতিবাদী মনোভঙ্গি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রায় সব ছোটগল্পের বিষয়ই হল অন্ত্যজ মানুষের জীবনালেখ্য। তাই কিছু কিছু গল্পে অন্ত্যজ মানুষের রাজনৈতিক জীবনের স্বরূপ ও বিবর্তনকে স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়।

গোরা উপন্যাসের ভারতীয় হিন্দুত্ববাদ

ড. রমেশ সরেন

সহকারি অধ্যাপক, বেলদা কলেজ

১৩১৪ সালের ভাদ্র থেকে শুরু করে ১৩১৬ সালের ফাল্গুন পর্যন্ত 'গোরা' 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ অবকাশ, স্ত্রী, কন্যা ও প্রিয়তম পুত্র শমীর আকস্মিক মৃত্যুতেও তার লেখা থামেনি। ধারাবাহিক বত্রিশ কিস্তিতে রবীন্দ্রনাথের এই সৃষ্টি সাধনায় কোন বিরাম বা বিচ্যুতি নেই। বলা যায় নির্মম সংসার জীবনে জ্বলতে জ্বলতেই তাঁর এই নির্মাণ কাজ। প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুতে অন্ধকারের বুকে জমে থাকা ভূগর্ভস্থ লাভা পৃথিবীর বহির্ভাগে এসে রবীন্দ্রনাথের কারখানা-ঘর থেকে আলোক শলাকা হাতে বেরিয়ে এলো তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টি 'গোরা' উপন্যাস।

'গোরা উপন্যাসে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদ' এই গবেষণা পত্রে 'গোরা' উপন্যাসে গোরার হিন্দুত্ববাদ ও রবীন্দ্রনাথের সময় এই দুটি বিষয়কে পাশাপাশি রেখেই আমার এই আলোচনার অবতারণা।

-এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'গোরা' উপন্যাসে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদ বিষয়টি জানতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সময়কে এবং তার পরিবারের ইতিহাস জানা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের পরিবার ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত। গোরা উপন্যাসের যে দ্বন্দ্ব তা আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নয়, নব্য হিন্দু সমাজ তথা কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে।

ঊনিশ শতকের সাতের দশকের পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ভারতের ভাবনায় সদা জাগ্রত।এসম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস' গ্রন্থে বলেছেন- রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের "পটভূমিকায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের এক রাজনৈতিক চেতনার প্রেরণা বর্তমান।" গোরা উপন্যাসে এই ধর্মীয় আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদ কিভাবে বিশ্বমানবতার আদর্শে রূপান্তরিত হয়েছে তারই বিশদ আলোচনা এই গবেষণা পত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ডাক্তার বনফুলের নির্বাচিত উপন্যাসে ডাক্তারি জীবিকার সংকট

ড. রাকেশ জানা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ

চিকিত্সা বিজ্ঞানীর নিরাসক্ত দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি বনফুলের সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছিল।বনফুল ডাক্তারের পেশায় এই চাতুরী ও অর্থলোভী দিকটি সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসে শুধু চরিত্রবান আদর্শবাদী ডাক্তার নেই, আছে আরেকদল ডাক্তার যারা আইন বাঁচিয়ে মিথ্যে সার্টিফিকেট দেন, বিধবা কুমারীর গোপনে গর্ভপাত করান, অকারণে ফরসেপস্ লাগিয়ে তড়িঘড়ি প্রসব করান, মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভদের নতুন পেটেন্ট ওষুধ রুগীদের প্রেসক্রাইব করে কমিশন পান, রোগীদের অযথা টেস্ট করতে দিয়ে প্যাথলজিতে পাঠানো ও কমিশন নেওয়া, এভাবেই মহৎ চিকিৎসা পেশাকে কিছু ডাক্তার ব্যবসায় পরিণত করেছে। ডাক্তারীতে রুগীর চেয়ে রুগীর বাড়ীর লোকজনদের দিকেই বেশি লক্ষ্য রাখতে হয়। পশার জমাবার এই মূলমন্ত্র। তাঁর উপন্যাসে ডাক্তারি বৃত্তিতে (এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ ও কবিরাজ) সমস্যার প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি দেখেছেন কলকাতায় রয়েছে আপ-টু-ডেট চিকিত্সা পদ্ধতি, তবুও রোগী মরে। তাই চিকিত্সকের হাতযশের চেয়ে রোগীর জীবনীশক্তির উপর বনফুলের বিশ্বাস বেশি। তিনি বহুক্ষেত্রেই দেখেছেন গরীবদের অসুখ সহজেই সারে ইমিউনিটির জোরে, সে তুলনায় বড়লোকের অসুখ ইমিউনিটির অভাবে সারতে দেরী হয়। প্রথাগত ভাবে মেডিক্যালে ডিগ্রীধারী না হয়েও গ্রামাঞ্চলে অনেকে নিষ্ঠার সাথে ডাক্তারি করেন। অনেক সময় ডাক্তাররা বিনা পারিশ্রমিকে দুঃস্থ মানুষদের চিকিত্সা করে থাকেন।

আমার ভাবনায় সাহিত্যাঙ্গনে - ছড়ার রূপ ও রূপান্তর

রাজু ভুঁই

State Aided College Teacher, **গড়বেতা কলেজ,**

লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা ছড়া। ছেলেবেলায় হাঁটি হাঁটি পা পা থেকে আজ পর্যন্ত ছড়ার সুর মন ও প্রানকে দোলায়িত করে। ছড়ার সাথে সাথে ঠাকুমার হারিয়ে যাওয়া সময়গুলি আজও স্মৃতিতে বহমান। ছড়ায় চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি।

ছড়া অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়,তা কালের গন্ডী ও স্থানের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। তবে ছড়ায় একটি সময় ও সমাজের প্রতিচ্ছবি বহন কর। যেমন - "ছেলেঘুমালো পাড়াজুড়ালো বর্গী এল দেশে / বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবে কিসে?"

এখনে বর্গীর হাঙ্গামার ছবি স্পষ্ট।

ছড়া লোকসাহিত্যের অন্যান্য ধারাগুলির প্রানভোমরা। তাই ছড়ার সাথে ধাঁধা, প্রবাদ, লোকগান, ও লোককথা, সঙ এর নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। প্রতিটি ধারার ভঙ্গি ও গঠনে ছড়ার সুর লক্ষণীয়।

গ্রাম বাংলার এই মৌখিক ছড়াগুলি সংগ্রহ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লোকসাহিত্য গ্রন্থের 'ছেলেভুলান ছড়া -১' ও 'ছেলেভুলানো ছড়া-২' ছড়ার অমর সংকলন। যা শুধু রবীন্দ্রনাথ কে নয় আপামর শিশুকে মাতিয়ে তুলে ছিল। তার সংকলনে 'আগডুম বাগডুম', 'নোটোন নোটোন পায়রাগুলি' মত কত শত ছড়ায় এখনও শিশু মনকে আকৃষ্ট করে চলেছে।

ছড়া সহ লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা সংগ্রহে শুধু রবীন্দ্রনাথ নয় ঠাকুরবাড়ির অনেকের বিশেষ ভূমিকা ছিল। অবনীন্দ্রনাথ কাছে পেয়েছি 'ক্ষীরের পুতুল' এর মতো সংকলন। পরে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমনির ছড়া' কথা আমরা ভুলতে পারি না।

শুধু লোকসাহিত্য নয় শিষ্ট সাহিত্যের অলিতে গলিতেও ছড়ার রাজত্ব। উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী থেকে শুরু করে অন্নদাশঙ্কার রায়ের কবিতায় ধরা পড়েছে ছড়ারই আঙ্গিক। শুধু তাই নয় উনবিংশ, বিংশ শতাব্দীর কবিদের কবিতায় ছড়ার আঙ্গিকেই বাস্তব সমাজ ও মানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে। কোন কোন কবির কবিতায় রূপকথার মোড়কে ধরা দিয়েছে বাস্তব জীবনানুসঙ্গ।

বর্তমানে ছড়ার চেয় আবালবৃদ্ধবনিতা মোবাইলে আসক্ত। ফলে ছড়া জগৎ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে পড়েছে। আমাদের উত্তরসূরীরা যান্ত্রিক মননে হয়তো একদিন লোকসাহিত্যের এই জনপ্রিয় ধারার কথায়ই ভুলতে বসবে।

সাহিত্যের আলোকে সমাজ-সংস্কার : প্রসঙ্গ রাজা রামমোহন রায়ের 'সতীদাহ-প্রথা'র উচ্ছেদ

রাজেশ্বর পাল
প্রাক্তন ছাত্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (গোলাপবাগ ক্যাম্পাস)

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন আধুনিক নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। তিনি হিন্দুধর্মের প্রচলিত কুসংস্কার, লোকাচার ও পুরোহিততন্ত্রের স্বৈরাচারী ও মূঢ় আচরণের প্রতি ছিলেন স্বভাবতই বিমুখ। তাই তাঁর সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মন হিন্দুসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল। এগুলি নিবারণের উদ্দেশ্যে হাতিয়ার হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সাহিত্য রচনাকে। সাহিত্যের বর্ণচ্ছটায় দূরীভূত করতে চেয়েছিলেন মানুষের অবচেতন মনের গাঢ় অন্ধকারকে, অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন সুচেতনার আদর্শ জগৎকে। হিন্দুশাস্ত্র মন্থনের দ্বারা তিনি দেখাতে চেয়েছেন সতীদাহ-প্রথা অশাস্ত্রীয় ও ধর্মবিরুদ্ধ। পরিণামে রক্ষণশীল সমাজের প্রতিকূলে তাঁকে বাদানুবাদে লিপ্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি দমে যান নি। অনড় মনোভাবের রামমোহন শেষ পর্যন্ত সমাজপতিদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে জনমত গঠনের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা রদ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

নলিনী বেরার *সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা* উপন্যাসে লোকজ উপাদান অনুসন্ধান

রিঙ্কু দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

আধুনিক উপন্যাস এবং লোকসংস্কৃতি দুয়েরই উপাদান সমাজ ও মানব জীবন থেকে গৃহীত।তাই এই দুয়েরই সম্পর্ক এবং অভিঘাত আলোচ্য বিষয়। Folklore কথাটির নানা পরিভাষা তৈরি হয়েছে। বাংলা উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির ব্যবহার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে শুরু হলেও নলিনী বেরার কথাসাহিত্যে লোকসংস্কৃতির ব্যবহার দেখাও যায়। লোক সংস্কৃতির বিষয় দৈহিক ক্রিয়াধর্মী, শিল্পধর্মী, বাকধর্মী, প্রয়োগধর্মী, বিশ্বাস-অনুষ্ঠানধর্মী, এর সঙ্গে ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্পতত্ত্ব জড়িত।নলিনী বেরা তাঁর *সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা* উপন্যাসে যে অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি বর্ণনা করেছেন তাহল- দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সঙ্গমক্ষেত্র, যা 'জঙ্গলমহল' নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটিতে মিশ্র সংস্কৃতি দেখা যায়। ঔপন্যাসিকতাঁর আখ্যানে এই অঞ্চলের লোকজ উপাদান- লোককথা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোকগান, লোকভাষা, কিংবদন্তি প্রভৃতি উপাদানকে উপন্যাসে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের আঞ্চলিকতা, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মীয় সংস্কার আলোচনা

রিয়ালী বসু

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ

বাংলা সাহিত্যে বিশেষ জনগোষ্ঠী নিয়ে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। আর সেই ধারায় অদ্বৈত মল্লবর্মনের রচিত 'তিতাসএকটি নদীর নাম' উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা। নানামাত্রিক সামাজিক অবজ্ঞা আর উদাসীনতায় কেটেছে তার শৈশব জীবন। যে পরিবেশে তিনি লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছেন, সেই জীবনকেই তিনি এই উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে অঙ্কন করেছেন। আঞ্চলিক উপন্যাস হচ্ছে একটি অজ্ঞাত কৌতুহলোদ্দীপক জনজীবনের অন্তরঙ্গ রুপায়ন।

তিতাস নদীকেই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা হয়। এই নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রাম বাংলার মালোদের সংগ্রাম ও প্রতিরোধের কাহিনী। রাইন, টেমসের মতো ক্ষুদ্র নদীর তীরে যেমন গড়ে উঠেছিল নদীকেন্দ্রিক ইউরোপীয় সভ্যতা, তেমনি তিতাসের তীরেও গড়ে উঠেছিল এক সৃষ্টিশীল জীবন ও সংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

এই উপন্যাসের মধ্যেই শ্রমজীবী মালোদের চিরায়ত চিত্র বর্ণিত আছে। তিতাসের বুকে তারা নৌকা চালায়। এই তিতাসের মাছ ধরেই তারা জীবিকা নির্বাহ করে। জেলেদের পাশাপাশি যে চাষিরা এখানে বাস করত তাদের জীবন ও জীবিকার কথাও লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে। ঘরে ধান থাকলেও তাদের কোমরে গামছা জোটেনা। ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে অনেক চাষী জমি পর্যন্ত বিক্রি করে সর্বশান্ত হয়। জলের ওপর তাদের ভরসা কম ফলে মাটি তাদের কাছে খাঁটি। জেলেদের সঙ্গে চাষিদের যে এই অর্থসামাজিক দৈন তা ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। তেমনি যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিভিন্ন সংস্কৃতি যে মানুষের মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে সেই রকম বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির পরিচয় পাই আমরা 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। উপন্যাসের কাহিনী ও ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছে যে পূজাকে কেন্দ্র করে সেটি হল মাঘ মন্ডলের ব্রত উপলক্ষে দিনোনাথ মালোর মেয়ে বাসন্তীর চৌয়ারি বানানো ও ভাসানো নিয়ে। শত দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়েও তারা এই পূজা করে। এই পূজা কুমারী মেয়েরা উপযুক্ত বর পাওয়ার জন্য করে থাকে। আসলে এই ধরনের পূজা-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে স্বাভাবিক যোগাযোগ ঘটে তা এখানে সূচিত হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যেমন কালীপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, নৌকাবাইচ, হোলি, উত্তরায়ন সংক্রান্তি ইত্যাদি।

আঞ্চলিক উপন্যাসের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জনপদের নিজস্ব ভাষা। মালোদের মুখে ঔপন্যাসিক বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন যেমন ডোল, খেউ, চড়কি, টেকো, চৌয়ারি প্রভৃতি। এছাড়াও আছে বহু প্রবাদ-প্রবচন এর ব্যবহার যেগুলি তিতাসের তীরবর্তী মানুষের মনোভাব বিশ্বাস-সংস্কারের দীপ্ত উদ্বোধক।

কিন্তু চতুর্থখন্ডে দেখা যায় মালোদের সমাজচিত্র অনেকটা কৌতূহলোদ্দীপক। এতে আমরা মালোসম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি, আধুনিক চটুল বর্ণসংকর, রুচি ও আমোদের ওপর বিপর্যয় ও বর্ণবিলুপ্তির একটি গভীর জীবনবোধ সমৃদ্ধ পরিচয় পাই।এতদিন তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল বর্জ্যের মতো দৃঢ়। তাদের সেই ঐতিহ্য ফাটল ধরল যাত্রাপালাকে কেন্দ্র করে। তারা দুটি দলে ভাগ হয়ে গেল একদল কালোবরনের বাড়িতে অন্য দল মোহনের বাড়িতে আসর জমায়। অবশ্য মোহোনের বাড়ির গানেই মালোদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষা হয়।এ থেকেই বোঝা যায় যে মালোদের সংস্কৃতির আবরণ কতটা খসে গেছে। আসলে প্রথাগত নিয়ম মেনে ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেননি। বাংলাদেশ কিংবা অন্যান্য দেশে হাজারো মালোপাড়া আছে। তাদের হাসি কান্নার হিসাব কেউ রাখে না ফলে বলা যেতে পারে লেখক যদি ওই জনগোষ্ঠীতে না জন্মাতো তাহলে এদের জীবনের ইতিহাসও কারো জানা হতনা। তাই বলা যেতে পারে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মন মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় যে জীবনকে অঙ্কন করেছেন সে জীবন নগর কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মানুষের অভিজ্ঞতা বহির্ভূত। মালোদের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে। তিতাসের জনপদের বর্ণনার সঙ্গে সেই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার বিশ্বস্ত রূপায়নে, এই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

শম্ভু মিত্রের প্রবন্ধ : 'কয়েকটি অভিনয়ের জন্মকথা'

লিপিকা সরকার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ

কবিগুরু সরণি, দুর্গাপুর-১৬

একজন মহৎ নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্র একইসঙ্গে ছিলেন অভিনেতা, নাট্যনির্দেশক ও নাটককার। শম্ভু মিত্রের নাট্য-জীবন শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। 'রঙমহল' থিয়েটারে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর অভিনয়ের সূত্রপাত। 'রঙমহল' হয়ে 'মিনার্ভা, 'নাট্যনিকেতন' ও 'শ্রীরঙ্গম'-এ এসেছিলেন তিনি। তারপর বাংলার গণনাট্য সংঘ তাঁকে ডেকে নিয়েছিল অভিনয়ের জন্যে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন থিয়েটারে, বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। অনেকগুলো থিয়েটার ঘুরে গণনাট্য সংঘে এসে শম্ভু মিত্র কিছুটা স্বস্থিবোধ করেছিলেন। গননাট্য সংঘের হয়ে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের প্রযোজনা করেছিলেন তিনি। এটি তাঁর প্রথম সার্থক প্রযোজনা। 'নবান্ন'র প্রযোজনার মধ্য দিয়ে নবনাট্যের ভিত শম্ভু মিত্ররা গড়ে তুলেছিলেন। তবে সেখানে স্বাধীন শিল্পীসত্তার ওপর এক ধরনের বাধ্যবাধকতা চেপে বসায় শম্ভু মিত্রকে গণনাট্য সংঘ ছাড়তে হয়েছিল। শিল্প হলো স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত সত্তার প্রকাশ, সেখানে বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। নিজের সর্বস্ব দিয়ে দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে শম্ভু মিত্র নাট্যাভিনয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেখানে আলাদা করে কোনো শর্ত তিনি মানতে পারেননি, তাই সেদিন গণনাট্য সংঘের ভাঙনে অন্যান্যদের মতো শম্ভু মিত্রও গণনাট্য সংঘ ছেড়ে এসেছিলেন। গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি গঠন করেন 'বহুরূপী' নাট্যদল। ১৯৪৮সালে গঠিত 'বহুরূপী' নামক একটি অপেশাদার নাট্যদল নবনাট্যের আদর্শ গ্রহণ ক'রে, দেশের মানুষের প্রতি একইরকম দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন 'ভালো করে ভালো নাটক' তাঁরা করে যাবেন। শম্ভু মিত্র সেই দায়ভার মাথায় নিয়েই আজীবনকাল ভালো নাটক করার সাধনায় মগ্ন থেকেছেন। নাট্যক্ষেত্রে শম্ভু মিত্রের কৃতিত্ব ও ব্যক্তিত্ব আমরা সকলেই জানি। তাঁর নাট্যজীবনের নানা দিক, যথা : নাটক লেখা, নাটকে অভিনয় করা, নাট্যপ্রযোজনা ও নাট্যনির্দেশনা করা, অর্থাৎ নাটক সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সৎ-সচেতন ও বিচক্ষণ ছিলেন। নাট্য-সংক্রান্ত যে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তিনি হয়েছেন চলারপথে, সেই সকল বিষয় নিয়ে অগণিত প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি শুধু নাট্যব্যক্তিত্ব নন, তিনি বাংলাসাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। 'বহুরূপী' নাট্যদল গঠন হওয়ার পর, সেখানে যেসব নাটক অভিনীত হয়েছে, সেই সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন আলোচ্য প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয়। ১৯৫৫ সালে লেখা প্রবন্ধটিতে 'বহুরূপী'র নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারবাহিকতা আমরা পেয়ে যাব বর্তমান আলোচনায়।

চর্যাপদে নারী-ভাবনা : সমকালীন সমাজে নারীর স্থান ও ভূমিকা, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে আলোচনা

লুসী মণ্ডল

অতিথি অধ্যাপক, চারুচন্দ্র কলেজ

বাংলাসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীনতম নিদর্শন "চর্যাপদ"-এর বয়স কমবেশি প্রায় হাজার বছর। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে চর্যার পুঁথি আবিষ্কার করে, ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে আমরা মোটামুটি ৫০জন সিদ্ধাচার্য ও ২৩জন পদকর্তার নাম পাই। যেমন: লুইপা' কুক্কুরীপা' বিরুআপা' কাহ্নপা' আরো অনেকে। শাস্ত্রী মহাশয় 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'এর যে খন্ডিত পুঁথিটি প্রকাশ করেছিলেন, সেখানে সাড়ে ছেচল্লিশটি চার্যগীতির মধ্যে সতেরোটি চর্যায় নারী-বিষয়ক বিভিন্ন প্রসঙ্গ পেয়েছি। চর্যাগীতিতে প্রতিফলিত সমাজব্যবস্থা ও গোষ্ঠীজীবন ছিল নিম্নশ্রেণীভুক্ত; অন্ত্যজশ্রেণী দ্বারা গঠিত। যাদের বসবাস ছিল নগরকেন্দ্রিক আর্যসমাজের বাইরে। এরূপ ব্যবস্থার কারণ উচ্চবর্ণ তথা ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীকে যেন নিম্নবর্ণের ছায়া মাড়াতে না হয়। ব্রাহ্মণরা একদিকে অন্ত্যজ-নারীদের অস্পৃশ্য বলে বিধান দিত, অন্যদিকে নিঃসংকোচে প্রতিরাত্রে তাদের শয্যাসঙ্গী হতে চাইত (১০নং চর্যা)। বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে অন্ত্যজ-নারীগণ বেশ স্বাধীন ছিল। যদিও বর্তমান সময়ের মত তৎকালীন সমাজেও ডোম-নারীরা গ্রামের প্রান্তভাগে একাকী বাস করত। কারণ তাদের পেশা ছিল মড়া পোড়ানো। যদিও তারা আরো বিভিন্ন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল। যেমন: খেয়া পারাপার, তাঁত বোনা, চাঙ্গাড়ি তৈরি ইত্যাদি। সেইসময় বিভিন্ন ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠান উদযাপন হত বিশেষ বিশেষ দিনে এবং নারী ও পুরুষরা একসঙ্গে সমবেত হয়ে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হতো, তাদের মধ্যে লজ্জার ভড়ং ছিল না।

'চর্যাপদের যুগে নারীর স্থান ও ভূমিকা' বর্তমান সময়ে প্রেক্ষিতে আলোচনা করলে সেখানে দেখি উনবিংশ শতাব্দীতে নারীদের স্বাধীনতা অনেকখানি খর্ব করা হয়েছিল নানারকম সামাজিক অনুশাসনের ভয় দেখিয়ে। যার ফলে বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়ের মতো মনীষীরা বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজে নারীর স্থান, নারী-স্বাধীনতা, স্বাভিমান-আত্মমর্যাদাবোধ অনেকখানি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবকাশ পেয়েছিল। যদিও তার পেছনে ছিল বহু অবহেলিত অসহায় নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। যা সাহিত্যের ভাষায় 'নারীচেতনাবাদ' নামে পরিচিত। একবিংশ শতকে সমাজে নারীদের স্বাধীনতা আরো অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। নারী শিক্ষার হার বাড়ে। ফলে সামাজিক বিধি নিষেধের বেড়াজালে অতিক্রম করে তারা নির্দিধায়।

৫০টি চর্যাগীতির মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা হল, যেখানে চর্যার যুগে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা বিষয়টি স্পষ্ট ধরা পড়ছে। এছাড়াও অন্যান্য অসংখ্য চর্যাগীতিতে প্রকাশিত আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে মূল নিবন্ধে। সেইসঙ্গে দেখানোর চেষ্টা করেছি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে আলোচনাটি কতখানি প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসঙ্গত।

রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার

লোপামুদ্রা জানা

ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

নিজের সমকালে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। প্রথমে স্বদেশী যুগে, তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-কালে তাঁর লেখনীতে নবমাত্রা সংযোজিত হয়। বিশ শতকের তিনের দশকে কল্লোলের কবিদের সামনে রবীন্দ্রনাথকে একরকম অগ্নিপরীক্ষা দিয়েই উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল। অবশ্য কল্লোলীয়রাও তাঁকে প্রথম আধুনিক কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে নিঃসঙ্কোচে। পরবর্তী বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন আন্দোলন ও পট-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। কিন্তু রাবীন্দ্রিক ভাবনায় ছেদ পড়েনি গুরুতর ভাবে। শুধুমাত্র 'রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজে'র কবিরাই নন, তাঁর প্রভাব যেন সর্বত্র বিরাজমান ছিল। শুধুমাত্র সাহিত্যের জগত নয়; সমাজ-ভাবনা, পরিবেশ-চেতনা, সামগ্রিক জীবনবোধ সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ, আর রবীন্দ্রনাথ। আজও কি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাংলার সাহিত্যিক মহল পুরোমাত্রায় কাটিয়ে উঠতে পেরেছে? চেষ্টা করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কতটা পেরেছে, কতটা পারেনি তা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হয়। মূল আলোচনাতে আমি সেদিকেই দৃষ্টিপাত করতে চাইছি।

সুবোধ ঘোষের কিশোর গল্প : সময়ের ছায়া, সমাজের ছবি

শতাব্দী শিকদার

গবেষক, SACT, ফকিরচাঁদ কলেজ

৪০ এর দশকের বাস্তববাদী গল্পকারদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ ছিলেন অন্যতম। ১৯৪০ এ "ফসিল" গল্পের মধ্যে দিয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাঁর বড়দের সাহিত্যের পাশাপাশি, ছোটদের গল্পগুলিতেও উঠে এসেছে সমাজ ও সমকালের বিশ্বস্ত চিত্র। যে সময় তিনি আত্মপ্রকাশ করেন, যুদ্ধ, আন্দোলন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দোলাচলতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল আমাদের দেশ তথা রাজ্য। সাধারণ মানুষ ক্রমশ তার

মূল্যবোধ হারাচ্ছিল। সুবোধ ঘোষের কিশোর গল্পগুলি বানিয়ে বলা কোন রূপকথা বা রংবেরঙের গল্প নয়, বরং তার শিকড় রয়েছে বাস্তবের কঠিন কঠোর ভূমিতে।

লেখক তাঁর ভাইজিকে লেখা চিঠিতে গল্পের আদলে নানা সত্য ঘটনা ও জীবনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত শিশুর অনাহারে নিদ্রা থেকে শুরু করে অন্নহীন মানুষের হাহাকার অথবা ভিখারীর গর্ভে জন্মানো শিশুর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মত কঠিন, রুক্ষ, শুষ্ক বিষয়কেও তিনি অবলীলায় শিশু পাঠ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এছাড়াও উঠে এসেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গান্ধীজীর প্রভাব, জন মানসে স্বাধীনতা লাভের উন্মাদনা, আগস্ট আন্দোলন, নীলকর সাহেবের ইংরেজ কালচার ইত্যাদি। পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে কিভাবে একজন সাধারণ নারী, কখনো দেবী তো কখনো ডাইনী রূপে প্রতিভাত হয়- তাও তিনি ছোটদের গল্পেই বলেছেন। এর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজ ও সময়ে মানুষের অন্ধ বিশ্বাস, জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা এসবই উঠে এসেছে। গল্পগুলি হয়ে উঠেছে সময়ের জীবন্ত দলিল।

ছোটদের গল্প সাধারণত সাত রঙের রামধনু আঁকা সব পেয়েছির দেশের গল্প। সেখানে দুঃখ- কষ্ট এসবের প্রবেশাধিকার থাকে না। সামাজিক সত্য আর অনিশ্চয়তা তো নয় ই। এই মিথকে নস্যাৎ করে যিনি দুঃখে পিঙ্গল, শোকে ধূসর গল্প শোনালেন ছোটদের, তিনি সুবোধ ঘোষ। অথচ রচনার গুণে, প্রকাশের মহিমায়, গল্পগুলি অদ্ভুত সৌন্দর্য আর মানবিকতার আলোয় উজ্জ্বল। আজকের শিশু ভবিষ্যতের নাগরিক। তাই তার মন ও মনন পক্ষপাতহীন, ঋজু ও দৃঢ় হবে, সেটাই কাম্য। এইসব গল্পের অভিনব স্বাদ কিশোর মনে নতুনতর বোধের উদয় ঘটাবে,এবং সে তার চারপাশের জগৎ ও জীবনকে নতুন করে আবিষ্কার করবে। আর এখানেই গল্পগুলির অভিনবত্ব এবং সার্থকতা।

মগনলাল মেঘরাজ: ফেলু কাহিনির এক দুধর্ষ প্রতিনায়ক

ড. শাখী ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, স্বামী নিঃসম্বলানন্দ গার্লস কলেজ

যে কোনো গোয়েন্দাকাহিনিতে গোয়েন্দা চরিত্রের পাশাপাশি সমান গুরুত্বপূর্ণ হল প্রতিনায়ক অপরাধী চরিত্রটি। আধুনিক গোয়েন্দাসাহিত্যের অপরাধীরা জনপ্রিয়তায় গোয়েন্দা চরিত্রটিকেও টেক্কা দিতে পারে। এরকমই এক অপরাধী চরিত্র সত্যজিৎ সৃষ্ট মগনলাল মেঘরাজ। তার প্রখর বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরকে প্রতিপদে নাজেহাল করার ক্ষমতা পাঠককে বারংবার মুগ্ধ করেছে। অপরাধী হিসাবে তাঁর স্বতন্ত্রতাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

আধুনিক বিজ্ঞানে আধ্যাত্মিকতার প্রসার

শান্তিময় ঘোষ

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

আত্মহীন নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক মানব সমাজ আজ এই বিশ্বকে শাসন করতে গিয়ে বিজ্ঞানের দ্বারাই শাসিত হয়ে চলেছে, তা এখানে স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বিজ্ঞান আমাদের এই সমাজকে আধুনিক করে তুলেছে এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তুবিজ্ঞান আজও মানুষকে তার অন্তরের আধ্যাত্মিক চেতনা বোধের প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতেপারেনি, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আধুনিকতার ছোঁয়া আমাদের যতই স্পর্শ করুক না কেন আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তাকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। আধ্যাত্মিক চেতনা বোধের প্রসার আধুনিক বিজ্ঞানে কতখানি প্রভাব ফেলে তা দেখানো হয়েছে এই প্রবন্ধে। কিছু দার্শনিকগণ তাদের ধর্মীয়অভিজ্ঞতা দ্বারা ব্যক্তিমনের সুপ্ত আধ্যাত্মিকতাকে তুলে ধরেছেন। এই আধ্যাত্মিকতার সীমারেখা টানতে গিয়ে মানুষ বৈজ্ঞানিক স্তরে উপনীত হয়ে পড়েছে। এছাড়াও এই নিবন্ধটিতে আত্মহীন অবিবেকীয় যান্ত্রিক মানব সমাজ হতে আত্মশীল বিবেকীয় মানব সমাজে কিভাবে উন্নীত হওয়া সম্ভব তা নতুন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। সর্বোপরি, বিজ্ঞানের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সামঞ্জস্য বিধান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তাএই নিবন্ধে দেখানো হয়েছে।

বাংলা সাহিত্য চর্চা : বহুমাত্রিক চেতনায় অনুবাদ সাহিত্য

শিপ্রা ভট্টাচার্য

বাংলা বিভাগ

Centre for Distance and Online Education (CDOE)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

মানব জীবন বিচিত্র-বৈচিত্রেপরিপূর্ণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একাধিক ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস-সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহ সকলের রয়েছে। বিশ্বের সাহিত্য ও সংস্কৃতি কে সহজ ভাবে জানার মাধ্যম হল অনুবাদ সাহিত্য। অনুবাদ সাহিত্য মধ্যযুগের সাহিত্যধারাকে যেমন পুষ্ট করেছে তেমনি বর্তমানেও অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা চলছে।

নিশীথ ভড়-এর কবিতার বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ

শুভম চক্রবর্তী

পিএইচডি গবেষক, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

সাতের দশকের কবি নিশীথ ভড়ের কবিতা দ্ব্যর্থকতায় মণ্ডিত। এই দ্ব্যর্থকতাকে অনুধাবন করা যায় নিশীথ ভড়ের জীবন থেকেও। "বালক গড়ুর পড়ছেন মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আর দেখছেন সস্তার রংমাখা গণিকাদের।" পাঠবিশ্ব ও বাস্তববিশ্বের এই তারতম্য নিশীথের কবিতাকে বিশিষ্ট মাত্রা দিয়েছে। নিশীথের কবিতায় অবক্ষয়িত আধুনিক জীবনের কথা পাওয়া গেলেও তাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকে সহঅনুভূতির দ্যোতনা। আলো ও অন্ধকারের এই সমন্বয় তাঁর কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি উত্তর-আধুনিক কবি, কিন্তু তাঁর উত্তরাধুনিকতা Post modern-এর অনুরূপ নয়, অমিতাভ গুপ্ত, অঞ্জন সেন প্রমুখ উত্তরাধুনিকতার প্রসঙ্গে যে ঐতিহ্য অনুগমনের প্রবণতাটিকে চিহ্নিত করেছিলেন নিশীথের কবিতায় তার রসাত্মক প্রকাশ।এই প্রবন্ধে আমরা নিশীথ ভড়ের কবিতার অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ কিছু প্রবণতার কথা বলব।

কবি মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতায় বিষণ্ণতাবোধ

শোভনলাল বিশ্বাস

এম.ফিল, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

বর্তমান আলোচনার বিষয়ে কবি মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতায় বিষণ্ণতাবোধের অস্তিত্বের অনুসন্ধান একমাত্র লক্ষ্য। আমরা দেখেছি এই বিষণ্ণতাবোধ অগ্রজ কবিদের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল দুটি বিশ্বযুদ্ধের পরে পরেই।নব্বই দশকের কবি মন্দাক্রান্তা সেনকে এই শূন্যতা কতখানি গ্রাস করে আছে তা দেখে নেব তাঁরই কবিতার হাত ধরে। মনের অতল গহ্বরে নিরালা দুপুরের দরোজায় বিষাদ কেমন ভাবে কড়া নাড়ে, কেমন ভাবে দুটি হাত ধরতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত মুঠো ভর্তি আগুন জ্বলে ওঠে তার হদিস মেলে কি কবি মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতাগুলিতে? এই অনুসন্ধানের পথে এগিয়ে যেতে যেতে দেখে নেব তাঁর কবিতায় বিষণ্ণতাবোধ ব্যক্তিস্তরের নাকি সামাজিক ফল? এর তত্ত্বগত প্রেক্ষিত আর জীবনবীক্ষার মধ্যে মতানৈক্য বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।কবির কাছে এই বোধের আসল রূপ কী তাও বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

ফকিরমোহন সেনাপতি-র উনিশ বিঘা দুই কাঠা – একটি সামাজিক সমীক্ষা

ডঃ শ্রীতা মুখার্জী

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ সান্ধ্য, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বারকা, নিউ দিল্লি

এই নিবন্ধে ফকিরমোহন সেনাপতির 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' গ্রন্থের একটি সামাজিক সমীক্ষার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ফকিরমোহন সেনাপতি ছিলেন উড়িষ্যার প্রাণপুরুষ। তাঁর 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' গ্রন্থের রচনাকাল বিংশ শতাব্দীর অন্তিম ভাগ। এই গ্রন্থের তাৎপর্য হল এই যে এটি ভারতীয় ভাষায় লেখা প্রথম জমিদার-প্রজার অন্তর্বর্তী ক্ষমতা-সম্পর্ক ও তাদের মধ্যবর্তী শ্রেণীশোষণ সম্পর্কিত উপন্যাস। নিম্নলিখিত নিবন্ধে এই গ্রন্থের অন্তর্তদন্তে দেখতে চাওয়া হয়েছে সাহিত্যরূপে ও সমাজবদলের হাতিয়ার রূপে এটি কিভাবে বিশেষ হয়ে উঠেছে। 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল 'রামচন্দ্র মঙ্গরাজ'। এই রামচন্দ্র মঙ্গরাজের নিরীহ তাঁতী দম্পতি ভগিআ-শারিআ-এর জমি অন্যায়ভাবে দখল নেওয়া ও তাদের ওপর নির্মম অত্যাচারের ওপর ভিত্তি করেই এই উপন্যাসের মুল কাহিনী দাঁড়িয়ে আছে।

সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল': শতবার্ষিকীর আলোয় ফিরে দেখা

শ্রেয়সী দাস

স্নাতকোত্তর, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্যের নানা সংরূপের মধ্যে থেকে আমরা যখন সিরিয়স সাহিত্যের পাঠ নিই তখন সেখানে থাকে বুদ্ধির চর্চা। সেখান থেকে জ্ঞানের স্ফুরণ ঘটে। কিন্তু সবসময় যে ন্যায়-যুক্তি-বিশ্লেষণ এগুলো ভালো লাগবে এমন নয়। ফলে আমরা স্বাদ বদল করি। তেমনই স্বাদ বদলের উপায় আমাদের সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখায় বর্তমান। তেমনই একটি ধারা নন্‌সেন্‌স ধর্মী লেখা। এ লেখায় আমরা যার নাম একবাক্যে পেয়ে থাকি তিনি হলেন সুকুমার রায়। তাঁর লেখা 'আবোল তাবোল' প্রকাশের একশো বছর উপলক্ষে এই ফিরে দেখা। আমরা আমাদের মনকে আবোল তাবোলের মতো করে বয়ে নিয়ে যেতে চায় কি? এ প্রশ্ন মনে আসে, আর ভাবি, হলে মন্দ কী! সুকুমার রায় জীবিতকালে এই অমূল্য বইয়ের প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পাঠককে যা দিয়ে গেলেন তা অবিস্মরণীয় হয়েই থাকবে চিরকাল। শতবর্ষ উপলক্ষে এই বই সম্পর্কে মস্তিস্ক প্রসূত নানান ভাবনার বহিঃপ্রকাশ এই আলোচনার বিষয়বস্তু।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে নারী : প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিতে পঞ্চাশের মন্বন্তর

সংহিতা ব্যানার্জী

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলার এক কলঙ্কিত অধ্যায়। বিশ্বরাজনীতিতে ক্রমান্বয়ে সংঘটিত দুটি বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যাম্ভাবী পরিণামস্বরূপ বাংলায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার পরিণামস্বরূপ '৪৩ এ ব্যাপক খাদ্যসংকট মন্বন্তরের সূচনা করে। একদিকে ১৯৪২ এ অনাবৃষ্টি, পাশাপাশি ন্যূনতম শস্য উৎপাদনে মানুষের খাদ্য সংকটকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাংলায় বিপুল সৈন্যসমাবেশ সৈন্যখাতে খাদ্যমজুতকরণ, জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করতে সরকার কর্তৃক 'পোড়ামাটির নীতি' গ্রহণ, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সুযোগে একশ্রেণির মুনাফালোভী কর্তৃক কৃত্রিম অভাবসৃষ্টি ও কালোবাজারী, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মহার্ঘ্যতা সৃজন- বাংলার মানুষকে চরম সংকটের সম্মুখীন করে। সাহিত্য সমাজেরই প্রতিবিম্ব। সাহিত্যরূপ দর্পণে মানুষের আশা-আকাঙখা, সুখ-দুঃখ, সমৃদ্ধি-বিপর্যয়, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, রাজনীতি সবই প্রতিফলিত হয়। স্বভাবতই মন্বন্তররূপ জাতীয় বিপর্যয়ও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। চরমতম সংকট মুহূর্তে মানুষের জীবনযুদ্ধের ইতিবৃত্ত বিশেষত শ্রমজীবী, অভাবী মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে অগণিত সাহিত্যে।মানবতার পূজারী নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর 'দীপশিখা' নাটকে মন্বন্তরের নারকীয় পরিস্থিতির বাস্তবসম্মত প্রতিফলনের পাশাপাশি সমকালীন প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান ও ভূমিকার রূপায়ণ এক অভিনব পদক্ষেপ। বর্তমান গবেষণাপত্রে তার যথার্থতা রূপায়ণেই প্রয়াসী হয়েছি।

বঙ্কিমের উপন্যাস ও বঙ্গদর্শন

সংহিতা মাল

গবেষক, বাংলা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রয়োজনে ইংরেজদের সহযোগী হিসেবে নতুন বাঙালি মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ঘটে। এদের বেশিরভাগ ছিল বাঙালি হিন্দু এবং এরা ইংরেজি শিক্ষা লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এই ইংরেজি শিক্ষার দিকে বেশি ঝোঁকার ফলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ব্যবস্থা অবহেলিত হল। শিক্ষিত বাঙালি তার নিজে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিল। এইরকম এক পরিস্থিতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব।

তিনি চেয়েছিলেন মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চশ্রেণি এবং নিম্ন শ্রেণির বিভেদ ঘোচাতে। ইংরেজি ভাষা থেকে পাওয়া বিদ্যাকে যদি বাংলা ভাষার সাহায্যে সাধারণের মধ্যে ব্যপ্ত করে দেয়া যায় তাহলে নতুন যুগের, নতুন সংস্কৃতির বাণী জনসমাজে ছড়িয়ে পড়বে। আর এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রকাশ করেন 'বঙ্গদর্শন'। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত উপন্যাসের বেশিরভাগই প্রকাশিত হয় এই বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। যা বাঙালির নতুন যুগের উপযুক্ত হয়ে ওঠার দিকনির্দেশ করে।

বৌদ্ধ ধর্ম ও নারীদের নির্বাণ

সঙ্কেত সরদার

গবেষক, এম.ফিল, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

গৌতম বুদ্ধের অহিংসার বাণী, করুণার বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ধনী-গরিব থেকে শুরু করে, বিভিন্ন বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে আর্যসত্য উপলব্ধির মাধ্যমে জীবের দুঃখ মুক্তি যে সম্ভব তা এই ধর্মে প্রদর্শিত হয়েছে। সে যুগে নারীরা নানান ভাবে বঞ্চিত ছিল। নারীরা তাঁদের প্রচেষ্টা দ্বারা নিজেদের আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছিলেন। নারীর হীনত্ব এবং পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরা নতমস্তকে গ্রহণ করেননি। তাঁরা পুরুষের সমকক্ষ তা প্রমাণ হয়েছে। নির্বাণের স্বরূপ তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। অর্হৎ লাভ করেছিলেন বহু নারী। মহাপজাপতি গৌতমী ৫০০ ভিক্ষুণী নিয়ে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন। শর্তানুসারে আট গুরুধর্মও পালন করেছিলেন। নানান বিধি নিষেধ অতিক্রম করে তাঁরা নির্বাণ লাভ করেছেন। থেরীগাথায় তৎকালীন সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। ভিক্ষুণীদের অর্হৎ লাভের কাহিনী থেরীগাথায় চিত্রিত হয়েছে।বৌদ্ধ ধর্মে নারীরা কিভাবে বৌদ্ধ সঙ্ঘে স্থান পেয়েছেন এবং নির্বাণ লাভ করেছেন তা তুলে ধরার সংক্ষিপ্ত প্রয়াস করা হয়েছে এই নিবন্ধে।

কৃষ্ণকৌতুকীয় নাটক 'অতুলনীয় সম্বাদ' এবং শম্ভু মিত্র : একটি পর্যালোচনা

শ্রী সত্যজিৎ বসাক

গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

নাট্যজগতের নাট্যাচার্য মহাশয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের পর বাংলা নাট্যজগতের সর্বাধিনায়ক হলেন শম্ভু মিত্র। কারণ শম্ভু মিত্র একাধারে ছিলেন প্রশংসিত নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, নাট্যপ্রযোজক, নাট্যসংগঠক এবং অভিনেতা। ১৯৩৯ সালে 'রংমহল' – এ যোগদানের মধ্য দিয়ে পেশাদারি নাট্যমঞ্চে প্রথম পদার্পণ করেন। ১৯৪২ সালে 'উলুখাগড়া' নাটক লেখার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় নাট্যকার শম্ভু মিত্রের জীবনযাত্রা। ১৯৪২ সালেই তিনি 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এ যোগদান করেন এবং এই সংঘের মাধ্যমেই বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে যে গণনাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, সেই আন্দোলনে তিনি সামিল হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের তিনি নিজের উদ্যোগে গড়ে তোলেন এক নতুন নাট্যদল 'বহুরূপী'। বাংলা নাট্যজগতে 'বহুরূপী' নাট্যদলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'নবনাট্য আন্দোলন'। 'নবনাট্য আন্দোলন' তথা 'বহুরূপী' নাট্যদলের প্রাণপুরুষ ছিলেন নাট্যপরিচালক ও নাট্যকার শম্ভু মিত্র। ১৯৬৫ সালে 'অতুলনীয় সম্বাদ' নামে একাঙ্ক নাটকটি লেখেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র। নাটকটিতে শম্ভু মিত্র নিজের আসল নাম প্রকাশ করেননি। নাটকটির রচনাকালে তিনি 'সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়' ছদ্মনামটি ব্যবহার করেছিলেন। 'গর্ভবতী বর্তমান' নাটকটির মতো নাট্যকার শম্ভু মিত্র 'অতুলনীয় সম্বাদ' নাটকটিকে 'কৃষ্ণকৌতুকীয় নাটিকা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আসলে কৃষ্ণকৌতুকীয় নাটক বলতে একধরনের ব্ল্যাক কমেডি নাটককে বোঝায়। এই ব্ল্যাক কমেডি নাটকের বৈশিষ্ট্য হলো, নাটকের মধ্যে হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নাটকের অন্তরালে সমাজ ও জীবনের লুক্কাইত, গভীর এক কৃষ্ণচ্ছায়ার অস্পষ্ট প্রকাশ বা ইঙ্গিতকে সঞ্চারিত করে রাখা। এর ফলে কমেডির কৌতুকময় সুখকর ও হাস্যরসাত্মক রূপের আড়ালে এক জটিলতাপূর্ণ অশুভ সংকেতের ইঙ্গিত দেয়। এই বৈশিষ্ট্য গুলি প্রকাশ পেয়েছে নাট্যকার শম্ভু মিত্রের 'অতুলনীয় সম্বাদ' নাটকটির মধ্যে দিয়ে, যেখানে মানুষের জীবন যাপনের পুনরাবৃত্ত বা বারংবার ঘটেছে এমন কিছু একঘেয়েমির নাট্যরূপ দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে আধুনিক সভ্যতার যান্ত্রিক মানুষগুলোর ব্যস্তময় জীবনের মুহূর্ত গুলো। যেখানে পরিচিত মানুষগুলি একে অপরের সঙ্গে দেখা হলে পাস কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আর যদি মুখোমুখি দেখা হয়েও যায় সেখানে কথা বলার অবকাশ তারা পায় না। আর অবকাশ পেলেও সেটা দায়সারা গোছের হয়। সেখানে একে অপরকে জানাতে চায় তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা কিংবা আভিজাত্যের কথা কিংবা নানা ধরনের জীবনযাপনযোগ্য প্রকরণসর্বস্ব প্রাচুর্যের কথা। নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, সমাজে বসবাসকারী আধুনিক সভ্যতার আধুনিকবোধ সম্পন্ন মানুষগুলি কতটা স্বার্থপর জালিয়াতি ও ধাপ্পাবাজি চরিত্রের।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস: জীবনবোধের দর্পণে

সত্যজিত্ সরকার

গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবন বহু অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ তাই তাঁর লেখনী অত্যন্ত বাস্তব। তাঁর উপন্যাসে অতি সহজেই জীবনের পূর্ণ চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যি সত্যিই সেখানে স্থান পায় 'গাঁ-ঘরের কথা। অতি সহজেই পাশাপাশি অবস্থান করে যায় গ্রাম ও আধুনিকতা, পুরাণ ও ইতিহাস, সময় ও মৃত্যু, প্রকৃতি ও নিম্নবর্গীয় চেতনা। লোকায়ত জীবন, জনজাতির মানুষের কথা, তাদের সংস্কৃতির কথা, মানব-মানবীর চিরন্তন সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথা সুচিত্রিতভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে। আনন্দের বার্তা ও বেদনা একসঙ্গে বহন করার স্ববিরোধহীন শক্তির স্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তাঁর উপন্যাসগুলিতে। আসলে তিনি জীবনকে সম্পূর্ণ স্বীকার করতে চেয়েছেন। মেঠোপথের কাদামাখা জীবন থেকে শুরু করে নাগরিক জীবনের বর্ণময় উচ্ছ্বাস-- সবকটাকেই তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসের পাতায়। উপন্যাসগুলির চরিত্ররা মৃত্যুতুল্য কষ্টের মাঝখানে দাঁড়িয়েও জীবনকে ভালোবেসেছেন, শুধু জীবনের জন্যই। প্রতিটি উপন্যাসে তাই জীবনই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' : প্রসঙ্গ শৈলীগত অনুধাবন

সন্দীপ দাস

পিএইচ.ডি রিসার্চ স্কলার, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যযুগের মঙ্গল-বিষয়ক কাব্যধারার শেষ কাব্য হল ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল (১৭৫২ খ্রিঃ)। প্রথাগত মঙ্গলকাব্যের ধারায় রচিত হলেও অন্নদামঙ্গল অনেকাংশে স্বাতন্ত্রের দাবি রাখে ; সে তার বিষয়গত বিন্যাসই হোক, কিংবা সার্ফেসগত সাংগঠনিক স্ট্রাক্চারে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তখন হয়ে ওঠে প্রচলিত আর পাঁচটা মঙ্গলকাব্যের থেকে আলাদা। বিশেষত ভারতচন্দ্রের স্টাইল কিংবা কাব্যের সার্ফেসে ব্যবহৃত শৈলী তাকে আলাদা করে দেয়। বিশেষত সেই কারণই, উক্ত প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় অন্নদামঙ্গল কাব্যের পুনঃপাঠের দ্বারা শৈলীর অনুধাবন। কারণ, যে শক্তি দ্বারা একজন সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন আর পাঁচটা সাহিত্যিকের থেকে আলাদা তার মূলে আছে, তাঁর রচনার স্টাইল কিংবা শৈলী। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রই একজন কবি-সাহিত্যিকের প্রেমে পড়েন। তার দুটি দিকে থাকে কবি-সাহিত্যিকের কাব্যভাবনা; ও তার ভাবনাকে সঠিক স্ট্রাকচারে অবয়ব দান করা। যাকে আমরা বলব

শৈলী। সে যাই হোক, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কেন আর পাঁচটা মঙ্গলকাব্যের থেকে আলাদা হল? কেনই বা ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের শেষ কবি হয়েও তার কাব্যে আধুনিকীকরণের ছোঁয়া লাগাতে সক্ষম হলেন? সর্বোপরি তার কাব্য-রচনা সফলতার মূল-শক্তি কোথায় নিহিত ছিল? এই সব কয়টির উত্তরই মূলত শৈলীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। যেখানে মূলত শৈলীর বিভিন্ন আঙ্গিক যথা প্যারামিটার নির্দ্বিধায় ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। যেমন, মিল কিংবা পুনরুক্তি, ধ্বন্যাত্মক শব্দ কিংবা শব্দদ্বৈত, আবার কখনো ক্রিয়ার আপাতিক প্রয়োগ, ক্রিয়াহীনতা, বাক্যের সমান্তরতা ও বিপ্রতীপতার মত নানান শৈলীগত আঙ্গিক। তারই উপর ভিত্তি করে মূলত সাত প্রকার শৈলী উপাত্ত নিয়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের শৈলীগত চর্চা করা হয়েছে উক্ত প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী : প্রান্তজন

ড. সন্দীপ বর

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

প্রাচীন কাল থেকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অস্তিত্ব যেমন ঐতিহাসিক সত্য রূপে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে, তেমনি আবহমান কাল ধরে ভারতের জীবনধারার গতিপ্রকৃতি দেশ ও মাটির সঙ্গে মিশে নদীর প্রবহমান ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে বন্ধন সম্পৃক্ত। সামাজিক ক্ষমতার কাছে পরাজিত হয়ে একটি শ্রেণি শোষিত পদদলিত অপাংক্তেয় পতিত রূপে চিহ্নিত বঞ্চিত ও অবহেলিত হয়। এরাই সময়ে সাধারণ ব্রাত্য, অন্ত্যজ, প্রান্তিক বলে অভিহিত হয়। এরা আর্থসামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ। এদের পিছিয়ে পড়ার পিছনে আছে বর্ণগত বৈষম্য ও অর্থনৈতিক শ্রেণি বৈষম্য। এই বিসমতা নিয়ে যুগ যুগ ধরে উঁচু-নিচুর সমবায়ে ধনতন্ত্রের যে ইমারত গড়ে তোলা হয় তার একদম নিচের তলায় থাকে অন্ত্যজশ্রেণি যাদেরকে নিম্নবর্গ বা প্রান্তজন বলে আখ্যায়িত করা হয়। এদেরকে কমিউনিস্ট নেতা দার্শনিক আন্তেনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭)'সাবলটার্ন' নামে অভিহিত করেন। আর এই 'সাবলটার্ন' শব্দের মধ্যে কোথাও যেন লুকিয়ে আছে একটা পরাধীনতার জ্বালা একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক চেতনাকে স্তম্ভিত করে দেয়।

রবীন্দ্র নাট্য দর্শণে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের এক নিখুঁত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে রবীন্দ্রচেতনায় সমাজ ভাবনা ক্রমবিবর্তন ঘটেছে দেশ কাল কিংবা মানব জীবনের নানান রূপান্তরের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মানুষের উপর থেকে কোনদিন বিশ্বাস হারাননি বলেই মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি তাঁর অন্তরে প্রজ্বলিত ছিল। আজীবন ভূমির সঙ্গে

সম্পর্কযুক্ত প্রান্তিক মানুষদের সর্বহারা হওয়ার ইতিহাস কবির আজানা ছিল না। ধনতন্ত্র অপেক্ষা সমাজতন্ত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে গভীর আকর্ষণ ছিল জীবনের শেষ লগ্নে এসে কবি 'রাশিয়ার চিঠি'-তে সে কথা কবি স্পষ্ট ভাবে ব্যাক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেও কোনদিন সশস্ত্র সংগ্রামে যেমন অংশগ্রহণ করেননি তেমনি সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থনও করেননি। সত্য ও ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে তিনি এক অনাবিল শান্তি ও অহিংসবাদী আদর্শায়িত জগতের স্বপ্ন দেখে গেছেন। ফলে স্বাভাবিক নিয়মে রবীন্দ্র নাটকে নিম্নবর্গ রূপে চিহ্নিত কৃষক শ্রমিক সহ প্রান্তিক মানুষের কথা। বর্ণগত শ্রেণিবৈষম ও শোষণ বঞ্চনা ও নিপিড়নের বিরুদ্ধে কবি যেমন বলিষ্ঠ প্রতিবাদী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তার নাটকে তেমনি তাকথিত অন্ত্যজ ব্রাত্য শ্রমজীবী প্রান্তজনের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। 'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটকটি কবির এই চিন্তা ভাবনার সার্থক প্রতিফলন। কৃষিজীবী মানুষের গোত্রান্তর ঘটার ফলে পরিণত হয়েছে শ্রমজীবীতে। রবিন্দ্রনাথের ভাবনায় দানবীয় লোভের টানেই কৃষি প্রায় আত্মবিস্মৃত। কৃষিজীবী মানুষের ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের উৎকট চাপে গ্রামের পণ্য কুটির ছেড়ে শ্রমিকে পরিণত হয়ে অতি জঘন্য নারকীয় পরিবেশ যুক্ত শ্রমিকপল্লীতে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। আর এরই সুস্পষ্ট চিত্র রয়েছে রক্তকরবী নাটকের বর্ণিত যক্ষপুরীতে। শ্রমিকরা এই যক্ষপুরীতে সর্বরিক্ত ও সর্বহারা হয়ে যান্ত্রিক মানবতা বর্জিত জঘন্য পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হয়। এখানে শ্রমিকরূপী প্রান্তজনের মর্মান্তিক জীবনচিত্র নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পাঠক তথা দর্শকের কাছে তুলে ধরেছেন।

বিশ্বায়ন ও লোকক্রীড়া : সংকটের প্রশ্নে লোকক্রীড়া ডাংগুলি

সার্থক লাহা

এম.ফিল গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ৭০০০৩২

'সংস্কৃতি' শব্দটা সাধারনার্থে ইংরেজি 'culture'-র প্রতিশব্দ। সামাজিক জীবনযাত্রার রূপ (way of life) হল সংস্কৃতি। ভারতীয় সংস্কৃতি, মার্কিন সংস্কৃতি, সোভিয়েত সংস্কৃতি মতো বৃহৎ অংশ বাদ দিলেও জাতিভিত্তিক, বর্নভিত্তিক, অংশগ্রহনের ধারাভিত্তিক সংস্কৃতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। সংস্কৃতির একটি বৃহৎ অংশ হল- লোকসংস্কৃতি (Folk Culture)। লোকসংস্কৃতির ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানগত, নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, নন্দনতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি বিষয় থেকে ব্যাখ্যাত হতে পারে। এই লোকসংস্কৃতিই (Folklore) পরবর্তীকালে শিষ্ট সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। লোকসংস্কৃতির নানা অঙ্গের মতোই লোকক্রীড়া সমাজজীবনের একটি অন্যতম দর্পন। কিন্তু কালগতির সাথে বিশ্বায়ন, শিল্পায়ন, আধুনিকীকরন প্রভৃতি

কারনে অভিযোজনে অসমর্থ হয়ে পড়েছে লোকক্রীড়ার অনেকাংশ। আলোচ্য নিবন্ধে বাংলার অন্যতম লোকক্রীড়া হিসেবে ডাংগুলির উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা, খেলার ধরন, অংশগ্রহণকারী ও খেলার গুরুত্ব আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এবং একইসঙ্গে বর্তমান চিত্রে এই লোকক্রীড়ার কী অবস্থা, তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আলোচনায় মূলত একটি লুপ্তপ্রায় এবং গবেষণার আলোকে অনালোচিত লোকক্রীড়া হিসেবে ডাংগুলির অতীত ও বর্তমান অনুবন্ধ অনুধাবন করা এবং বিশ্বায়নের আবহে লোকক্রীড়ার কী ভবিষ্যৎ তা অনুসন্ধান করাই এক্ষেত্রে মূল অন্বিষ্ট।

অমর মিত্রের হাঁসপাহাড়ি : প্রান্তিক মানুষদের জীবনচিত্র

সুখেন্দু ঘোষ

গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ইংরেজি শব্দ 'মার্জিনালাইজ'-এর বাংলা আক্ষরিক অর্থ প্রান্তিক। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রবার্ট পার্ক ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে। তবে শব্দটি নিষ্পত্তি যেভাবেই হোক না কেন প্রাচীনকাল থেকে প্রান্তিক মানুষরা অবহেলিত, শোষিত, লাঞ্ছিত। অমর মিত্রের লেখায় চিরকালই সাধারণ মানুষের কথা উঠে এসেছে। তার 'হাঁসপাহাড়ি' উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। রবিলোচন ও বন্দনার পুত্র সুনন্দ। পরিস্থিতি ও আর্থসামাজিক কারণে সে কর্মহীন। রবিলোচন হাঁসপাহাড়ি অঞ্চলের রিটায়ার্ড ব্লক অফিসের বড়োবাবু। পুত্র সুনন্দের বেকার অবস্থাতে তিনি হতাশ হয়েছেন। তাঁর পরামর্শ সুনন্দ শোনেন না। সুনন্দ একসময় নিজের ব্যবসা শুরু করেন। হাঁসপাহাড়ির ভালগা পাহাড় কেটে পাথর তৈরির ব্যবসা। তার এই কর্মকাণ্ডের প্রধানকর্মী হল হাঁসপাহাড়ির খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষজন। যারা সভ্যতার পিলসুচ। সময়ে চক্রব্যূহে ও নিজের বুদ্ধিমত্তাতে সুনন্দ হাঁসপাহাড়ির প্রথম পুরুষ হয়ে ওঠেন। নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থের সে হাঁসপাহাড়ির বাউরি, লোহার প্রভৃতি মানুষদের বিশ্বাসের আশ্রয়স্থল বুড়ি ঠাকুরুনের পাথরের মূর্তি ভেঙে দেয়, তাদেরই অন্তরালে। তবুও তারা সুনন্দাকে বিশ্বাস করেন। আবার কাঁদনি বাউরিকে ধর্ষিত হতে হয় সুনন্দের কাছে। পঞ্চায়েতি রাজনীতির অরাজকতায় প্রান্তিক মানুষগুলোর জীবনে নেমে আসে কলেরার মড়ক। সাধারণ মানুষগুলো ভাবে বুড়ি ঠাকুরুনের অভিশাপে তারা জর্জরিত। কলেরা তাঁরই অভিশাপের ফল। উচ্চশ্রেণির মানুষদের সুক্ষ রাজনীতি এই প্রান্তিক মানুষগুলি ধরতে পারে না। কিন্তু তীব্র অসহায়তা থেকে প্রতিবাদ ঘনিয়ে আসে। আকাশ মেঘ মুক্ত হয়। কাঁদনি বাউরিকেও এমনই প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায় উঁচু শ্রেণি মানুষদের কাছে। পিছু হাঁটতে বাধ্য হয় তথাকথিত এলিট সমাজ। আলোচ্য প্রবন্ধে বুর্জোয়া শ্রেণির মানুষদের শোষণের সঙ্গে হাঁসপাহাড়ি'র প্রান্তিক মানুষদের জীবন যন্ত্রণার ও প্রতিবাদ কথা তুলে ধরা হয়েছে।

লোকসঙ্গীত বিবর্তনের ধারাপাত ও গাজন গান : প্রেক্ষিত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

সুচন্দন মণ্ডল

পি-এইচ.ডি গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শিবের নামে চৈত্রমাস জুড়ে মাতোয়ারা হয়ে পড়ে বঙ্গবাসী। চৈত্রমাসের শিবসাধনা সন্ন্যাস নামে পরিচিত। এইসময় গেরুয়া, হলুদ বসনে উত্তরীয় গলে ত্রিশূল হাতে সন্ন্যাসীরা কয়েকদিন পরিভ্রমণ করে। তারা শিবলিঙ্গ মাথায় নিয়ে বা জলভরা বাঁক কাঁধে নিয়ে শিবস্তুতিমূলক ধ্বনি দিতে থাকে। পণ্ডিতরা বলেন সন্ন্যাসীদের এই জোরে জোরে চিৎকার বা গর্জন থেকে 'গাজন' শব্দের উৎপত্তি। আবার গাজন (গাঁ= গ্রামীণ + জন= জনগণ) অর্থাৎ গ্রামীণ লোকসাধারণের নিজস্ব উৎসব। গাজনের ব্যুৎপত্তিগত এই ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান পালাগাজন উপস্থাপিত হয় শিব ব্যতীত। অর্থাৎ যে শিবকে কেন্দ্র করেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজনগান বিকাশ লাভ করেছিল বর্তমান সময়ে সেই শিব আড়ালে থেকে গেছে। পালাগাজনের সূচনায় এসেছে রাধাকৃষ্ণকেন্দ্রিক গীতিনাট্য। এরপরে থাকে ছক (টুকরো টুকরো সামাজিক পালা)। বর্তমান সময়ের গাজন গান শুধুই বিনোদনমূলক নয়। এর মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো হয় নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিতগ্রামীণসমাজে। গাজনগান যাত্রা বা নাটকের মত একমুখী কাহিনি নয়। এখানে থাকে ছয় থেকে আটটি ছোটো ছোটো আকারের ঘটনা। যার এক একটির সময়সীমা পনেরো থেকে ত্রিশ মিনিট। গাজনগান আমরা জানি চৈত্র-বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। সেদিক থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজনগান আলাদা মাত্রা পেয়েছে। সারাবছরব্যাপী চলে এই গাজনগান। আষাঢ় মাসের রথযাত্রা থেকে শুরু করে পরবর্তী রথযাত্রা আসার আগে পর্যন্ত যেকোনো উৎসবে গাজনগান অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। গাজনগানের উৎপত্তির সাথে হিন্দুধর্মের সম্পর্ক থাকলেও বর্তমান সময়কালে তা ধর্মীয় বেড়াজাল অতিক্রম করে গেছে। মঞ্চেই উপস্থাপিত হয় অহিন্দু ধর্মীয় কাহিনি। এছাড়া দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিষ্টান সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষজন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দিনমজুর, হতদরিদ্র, কৃষিজীবী মানুষজন সন্ধ্যার বিনোদন হিসেবে গাজনগান উপভোগ করে। আপাত অগভীর দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে গাজন গানের ভাষা অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। আসলে গভীর মনোযোগসহ উপলব্ধি করলে বোঝা যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের প্রাত্যহিক মুখের ভাষা এখানে প্রতিফলিত। কোনো কল্পিত অশ্লীল ভাষা এখানে ব্যবহার করা হয় না। লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধার সমন্বয়ে শিল্পীসৃষ্ট গানগুলি চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে। বর্তমান দিনের নানান ঘটনাকে কেন্দ্র করে গাজনগান রচিত ও অভিনীত হয়। বাল্যবিবাহ রোধ, বিদ্যুৎ চুরির সচেতনতা, রেশন দুর্নীতি, চাকরিতে স্বজনপোষণ কিংবা ঘুষ, দাম্পত্য সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থা, কৃষি কাজ, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গাজনগান রচিত হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষকে একলহমায় চিনতে হলে জানতে হলে গাজনগান থেকে তা সহজেই আয়ত্ত করাসম্ভব।

বিমল করের 'যদুবংশ' – ষাটের দশকের অস্থির সময়ের আলোকে

সুতনু দাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্ত জীবনের অন্যতম রূপকার বিমল কর পদার্পণ করেন। তাঁর বেশিরভাগ রচনায় কলকাতা শহর থেকে দূরে কোনো মফস্বল এলাকার নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি ফুটে ওঠে। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী দুই দশকে মূল্যবোধের ক্রমবিনাশ কীভাবে বাঙালীর সমাজ-সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে চলেছে তা লেখক তাঁর 'যদুবংশ' (১৯৬৭) উপন্যাসে দেখিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু সমস্যা থেকে শুরু করে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারত–চীন সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির বিভাজন, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে খাদ্য আন্দোলন প্রভৃতি নানান ঘটনা স্বপ্নবিলাসী বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনে চরম আঘাত হানে। ষাটের দশকের এই ক্ষয়িষ্ণু সময়ে দাঁড়িয়ে সমাজ, পরিবার সমস্ত দিক থেকে অবহেলিত হয়ে আদর্শচ্যুত, স্বপ্নভ্রষ্ট চার যুবক – সূর্য, বুললি, অভয়, কৃপাময় এর মধ্য দিয়ে লেখক এই উপন্যাসে সমকালীন সমাজ কে তুলে ধরেছেন।

মহেশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত উপন্যাসে বর্ণিত আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা

সুদীপা সাধু

গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে হলে স্রষ্টাকে নিবিড় ভাবে জানা এবং চেনা আবশ্যক। তেমনি এক অনন্যা সাধক সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী যার উপন্যাসের বিশাল জায়গা জুড়ে আছে আদিবাসী জনজীবনের কথা। কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে আদিবাসী জীবনে এসেছে বেশ কয়েকটি উপন্যাসে।

মহাশ্বেতার বেশ কিছু উপন্যাস বনজ ও জীবনযাত্রার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি চলচ্চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। তাদের সহজ সরল জীবনযাত্রা সাদামাটা আচরণ, তাদের শোষণ- বঞ্চনায়-উপেক্ষিত জীবনের হাহাকার প্রকটিত হয়ে উঠেছে। বিচারের বাণী নিরবে- নির্ভয় কাঁদে। তাদের চাওয়া-পাওয়া, না-পাওয়া রাধা- বিম্ন অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে এ ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নাগরিক শোষণ, বঞ্চনার হাত থেকে প্রতিবাদী সত্যায় জয়ী হয়ে উঠেছে, এমনই উপন্যাসদ্বয় অরণ্যই অধিকরণ ব্যাধখন্ড উপনিবেশিত সমাজ কাঠামোয় 'আপর' বলে চিহ্নিত আদিবাসী স্বাধীন ভারতের এ চিত্তরায়ন থেকে বিমূর্তি

লাভ করোণ; বরং তথাকথিত সভ্যতার ধারক-বাহক না হয়ে নিজের সংস্কৃতি ঐতিহ্য কে ধারণ করাই তাদের অসভ্য অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে মহেশ্বতাদেবী এ জনগোষ্ঠীর নিস্তেজতাকে শ্রদ্ধার সাথে উপস্থাপন করেছেন তাঁর উপন্যাসে। আদিবাসী জীবনে বঞ্চনা-হতাশা-নিপীড়ন এবং তাদের-স্বপ্ন -সাধ-আকাঙ্ক্ষায় বিস্তৃতায় ঋদ্ধ। তিনি আদিবাসী জীবনের চর্চা করেছেন। তিনি আদিবাসীদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা লাভ নিশ্চিত করতে এবং এ কারণে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের যথার্থ প্রতিফলনে আদিবাসী আদিবাসী জীবন চরিত্রের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ অভিসন্দর্ভ।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের গৌরব ও দুর্দশা-দু- প্রান্তকেই অতীত মুখিতায় আদিবাসী জীবনের সংগ্রামশীলতা গৌরব এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের নিপীড়িত-বঞ্চিত অবস্থার বিবরণ এবং তা থেকে উত্তরণের আশাবাদ ব্যক্ত করে লেখক সম্পূর্ণ ইতিবাচক দৃষ্টিকোণে- আদিবাসী জীবনকে তার উপন্যাসে উপজীব্য করেছেন।

বাংলা উপন্যাসে অরণ্যকে সোচ্চার সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভূমি এবং হাতিয়ার করে নিয়ে এলেন ভিন্ন ধারণায় উপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী। রোমান্টিক, ভাবালুতা বাব্যিক উচ্ছ্বাস ও অফুরান প্রকৃতির বর্ণনা নয়, মহেশ্বতার কলমে অরণ্য হয়ে উঠল বঞ্চিত অরণ্যক মানুষদের সংগ্রামস্থল। বোনের কোলে থাকা মানুষদের ওপর তথাকথিত সুসভ্য মানব সমাজের শোষণ ও অত্যাচার-মর্মস্পর্শী অথচ দৃপ্ত ভাষায় প্রতিপালদিত হলো।

অরণ্যকে মানুষ পর্যটনের কিংবা রহস্যময় আশ্বাদের অবস্থান বলেই মনে করত। কিন্তু সেই অন্যের মালিক-সেই আদিবাসী অরণ্যক মানুষরাই তাদের সমত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত। নাগরিক থাকায় অরণ্য নি:শোষিত হচ্ছে, অরণ্যক মানুষেরা তাদের যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মহেশ্বেতা নিখাদ দরদে তাদের কথা লিখেছেন প্রকৃত ইতিহাসকে সামনে রেখে।

'ব্যাধখন্ডে' মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন নগর আদিবাসীর অগ্রসরন, আদিবাসী জমি ছেড়ে চলে যাওয়ার নিষ্ঠুর বনোফসাদন, অরণ্য সন্তানদের অরণ্য অনুসন্ধান, মূল স্রোতের মানুষদের আদিবাসী সমাজ এক বিষয়ে মর্মান্তিক অজ্ঞতা।ব্যাধখন্ডে লেখিকার জনবৃত্তের ইতিহাস অন্বেষণ করেছেন।

মহেশ্বতা দেবীর 'ব্যাধখন্ড' উপন্যাস যাবব সমাজের জীবিকা, জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও নানান কথা ও উঠে এসেছে। আরাড়া গ্রামের কথা উঠে এসেছে। সেখানে বিভিন্ন জাতের মানুষ বসবাস করে।মহেশ্বতার ব্যাধখন্ড'-পুরান নয়, ইতিহাসেই সক্রিয় থেকেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমকালীন জীবন বোধ। এই উপন্যাসের কাল্যা চরিত্রটি প্রেরণা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপায়' গল্পে আশা ও মল্লিকা : একটি তুলনামূলক গবেষণা

সুধাংশু কান্তি মুড়িয়া

স্নাতক (ইংরেজি), ষষ্ঠ পর্ব, মেদিনীপুর সিটি কলেজ

কুতুরিয়া, ভাদুতলা, পশ্চিমমেদিনীপুর

বিভাজন সাহিত্য জানার আগে আমাকে জানতে হবে বিভাজন কি? সাধারণভাবে বলা যায় বিভাজন হল দুটি জিনিসের মধ্যে বিভক্ত হওয়া। সেটা হতে পারে দুটি রাজ্যের মধ্যে বা দুটি দেশের মধ্যে অথবা দুটি মনের মধ্যে। সাহিত্য ইতিহাসে বিভাজন সাহিত্যের অবদান অপরিসীম। শুধু বলা যায় না যে, বিভক্ত দুটি দেশের মধ্যে হয়, দুটি মনের মধ্যেও বিভাজন দেখা যায়। ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় কিছু সমস্যার সূত্রপাত রেখে যায় এই ভারতের মধ্যে। সেটি হল— ধর্মীয় মতবিরোধ, আর এই ধর্মীয় মতবিরোধের কারণে ভারত দুটি দেশে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথমটি হল ভারত, অপরটি হল পাকিস্তান। যার সময়কাল ছিল ১৯৪৭ সালে। সেই সময়কালে এই দুটি দেশের মধ্যে একটি বিশাল বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়।বিভাজন সাহিত্য কেবলমাত্র একটি দ্বন্দ্বকে নিয়ে আলোচনা করে না, স্থানান্তর, ধ্বংসাত্মক রূপ, লালসা, স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ, রাজনৈতিক দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলিকে নিয়ে আলোচনা করে। সেই সময়কালীন বহু মনীষীর আবির্ভাব হয় যাঁরা সেই সময়ের রূপচিত্রকে নিজের সম্মুখে অনুধাবন করেছেন। তাঁরা শুধুমাত্র তৎকালীন পরিস্থিতির রূপচিত্র দেখেন নি, সেগুলিকে তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেছেন। সেইসকল জ্ঞানীগুণীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— সদ্দত হাসান মান্তো, খুশবন্ত শিং, গৌতম মাধব, উরবসি বুতালিয়া, অত্তিয়া হোসেন। 'উপায়' হল একটি ছোটগল্প, স্বনামধন্য লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন এর রচয়িতা। এই গল্পে লেখক দেখিয়েছেন যে, দুস্থ সমাজের এক অবহেলিত পরিবার যেখানে মল্লিকা (গল্পের প্রধান চরিত্র), স্বামী ভূষণ, পুত্র খোকন ও বিধবা ননদ আশা বাস করে এবং নিজেদের জীবনকে চালিত করার জন্য রুচিরোজগারের পথও বেছে নিতে হয়েছে। যে সমাজে ছেলেদের কোনো কর্মসংস্থান এর পথ নেই সেখানে প্রমথ (গল্পের খলনায়ক), মেয়েদের কর্মসংস্থানের পথ দেখিয়েছেন মল্লিকা ও আশাকে, দেহব্যবসার মধ্য দিয়ে। তারা কীভাবে এই কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে নিজের সংসারকে রক্ষা করতে পেরেছে বা পেরেছে কিনা তারই রূপচিত্র বর্ণনা হয়েছে এই গল্পে। এই গল্পের মূল বিচার্য ও আলোচ্য বিষয়গুলি হল মল্লিকা ও আশা দু'জনেই কি সমাজের এক পক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে দাঁড়িয়ে, নিজের পরিবারকে বাঁচানোর কথা ভাবছে? মল্লিকা ও আশার চিন্তাভাবনা কি একই? দু'জনের কেউ কি চিন্তাভাবনা করছে না? তাদের ভাবনা-চিন্তায় তারা কিভাবে উত্তরণ করেছে? বর্তমান নিবন্ধে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে।

শরদিন্দুর গল্প-উপন্যাসে বিধবার প্রেমের জটিলতা ও সামাজিক প্রেক্ষিত

ড. সুনেত্রা ব্যানার্জী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শরৎ সেন্টেনারি কলেজ, ধনিয়াখালি, হুগলী

কৌলিন্য প্রথার বিষময় পরিণতি দীর্ঘ সময় ধরে সমাজকে বহন করতে হয়েছে। এই প্রথার ফলস্বরূপ হিসেবে এসেছে পুরুষের বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ। অষ্টম বর্ষের কন্যাকে বিয়ে দিতে উপযুক্ত কুলীন পাত্রের অভাবে বৃদ্ধের সঙ্গে বালিকার বিয়ে হত। তাই যুবতী হওয়ার আগেই বালিকা বয়সেই বিধবা হত। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হলেও সমাজের পক্ষে তা মেনে নেওয়া ছিল অসম্ভব। বিধবা মেয়েটি পরিবার তথা সমাজ সর্বত্র ছিল ব্রাত্য। ফলে তারা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকতো। সনাতনী সংস্কার আমাদের মনে এত গভীরে প্রোথিত যে মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে শারীরিক কৌমার্য অত্যন্ত গুরুত্ব পায়। তাই অনেক ক্ষেত্রে এইসব বিধবা মেয়েদের ভোগ করলেও তাদের প্রেমিকরা বিয়ে করে সম্মান দিতে চায় না। সমাজের প্রতিচ্ছবি কথাসাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক গল্প-উপন্যাসে বিধবার প্রেম বা তার যাপনে সমাজ কীভাবে জটিলতা সৃষ্টি করেছে তা মূল প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শরদিন্দুর ব্যোমকেশের কাহিনি অপরাধের গল্প হলেও তাতে সামাজিক প্রেক্ষিত গুরুত্ব পেয়েছে। তাই ব্যোমকেশের কাহিনিতেও বিধবার প্রেম মূল অপরাধের প্লটের সঙ্গে কীভাবে গ্রন্থি পাকিয়ে জড়িয়ে আছে তাও এই প্রবন্ধে দেখানো হবে।

কবিগানে বৈষ্ণব ভাবনা : একটি পর্যালোচনা

ড. সুবীর ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

কবিগান অখণ্ড বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট সংগীতধারা। কবিগান অপেক্ষা 'কবির লড়াই' হিসাবেই গ্রামাঞ্চলে কবিগানের সর্বাধিক প্রসিদ্ধি। কেননা কবিগানের লড়াইটাই মুখ্য ও উপজীব্য এবং দর্শক-শ্রোতার প্রধান উপভোগ্য। এই লড়াই হয় ছন্দ-লয়-তাল সমন্বিত সংগীতের মাধ্যমে এবং নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে। তবে লড়াই না বলে একে সুরারোপিত বাকযুদ্ধ বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কবিদলের প্রধান গায়কই কবিয়াল বা কবিওয়ালা। বর্তমানে তারা নিজেদের 'চারণকবি' বলে পরিচয়

দিতেই বেশি গৌরববোধ করেন। কবিগান মৌখিক সাহিত্য। লিখিত পাঁজিপুঁথি থাকলেও মৌখিক উক্তি-প্রত্যুক্তিই কবিগানের প্রাণ। কবিগান লৌকিক ধারা থেকে উদ্ভুত, মিশ্র উপাদানে গঠিত সম্পূর্ণ মৌখিক শিল্পকলা। যার সৃষ্টি গ্রামে, শ্রীবৃদ্ধি শহরে। কবিগানে বিষয় বৈচিত্র্য সীমাহীন। রামায়ণ, মহাভারত, শাক্ত, বৈষ্ণব, পুরাণ, কোরান, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি সবই কবিগানের বিষয় হিসাবে কবিগানের আসরে গীত হতে পারে। তবে কবিগানের সৃষ্টির সময় থেকে এত বিষয় বৈচিত্র্য ছিল না। তখন মূলত শক্তি-আরাধনার গান ভবানীবিষয়ক গান এবং রাধাকৃষ্ণের লোকায়ত প্রেমলীলার গান সখীসংবাদই ছিল মুখ্য। প্রাচীন সেই কবিগানে আজও বৈষ্ণবীয় তত্ত্বভাবনার প্রধান কিছুমাত্র কমেনি। প্রাচীন কবিগান থেকে আজকের আধুনিক কবিগানে বৈষ্ণবীয় ভাবনা কীভাবে রূপ পেয়েছে, তা তুলে ধরতেই এই গবেষণা প্রবন্ধের অবতারণা।

দুঃশাসন : এক কলঙ্কিত পুরাণকথার পুনরাবৃত্তি

ড. সুব্রত চক্রবর্ত্তী

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

বাংলা বিভাগ, মোহনপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানব সভ্যতার ধারাকে কলঙ্কিত করে চলেছে লাইক্যানথ্রোপেরা, যাদের মানস-রুগ্নতা কেবলমাত্র ভাবনার স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব জীবনে নগ্ন প্রকাশ ঘটায়। এরকম এক কুখ্যাত লাইক্যানথ্রোপ মহাভারতের দুঃশাসন। দুঃশাসন শুধু সেকালে নয়, একালেও সমান ভাবে সক্রিয়। আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দুঃশাসন' গল্পে মহাকাব্যিক চরিত্র দুঃশাসনের একালের চিত্রটি নিপুণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। বস্ত্রসংকটের প্রেক্ষাপটে সমাজের ভঙ্গুর ছবিটি লেখকের মরমী লেখনীতে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে।

বাংলা অণুগল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও বহুমাত্রিকতা

সুমন সরকার
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, পি.এইচ.ডি গবেষক, ছাত্র

বাংলা অণুগল্পের সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে 'লিপিকা' গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে। তবে সার্থক ভাবে বনফুলের কলমে অণুগল্পের পরিণতি লাভ হয়। তবে 'লিপিকা' পূর্ববর্তী কালেই অণুগল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়। ছাপাখানার যুগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলমে অণুগল্পের পূর্বজ রূপ দেখা গিয়েছিল। তাঁর 'বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ', 'কথামালা' ইত্যাদি গ্রন্থে অণুগল্পের নমুনা পাওয়া যায়। মূলত আয়তন সংক্ষিপ্ততার জন্যে তার লেখাগুলিকে অণুগল্প বলা যায়। এ প্রসঙ্গে অণুগল্পের সাধারণ সংজ্ঞার উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণত অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে যখন কোন ঘটনা বা কাহিনীকে গল্পের রূপ দান করা হয় তখনই সেটা অণুগল্প হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে অণুগল্পের প্রসারে বড় ভূমিকা পালন করেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। যেমন- 'পত্রাণু', 'কফিহাউস', 'অণুপত্রী', 'অল্পকথায় গল্প', 'ইসক্রা' প্রমুখ। এই পত্র-পত্রিকায় বনফুল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন লিখেছেন তেমনি অশোক রায় চৌধুরী, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, রতন শিকদার, প্রগতি মাইতি প্রমুখ বিশিষ্ট্য সাহিত্যিকেরা অণুগল্পের চর্চার ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখেছে।

এপার বাংলার পাশাপাশি বাংলাদেশেও অণুগল্পের ব্যাপক চর্চা চলছে। বিলাল হোসেন, মাহফুজ রিপনের মতো লেখকেরা নিয়মিত অণুগল্পের চর্চা করে আসছেন। বাংলাদেশেও 'অণুগল্প পত্রিকা', 'অনুভব পত্রিকা' ইত্যাদি পত্রিকায় অণুগল্পের চর্চা নিরন্তর হচ্ছে। বিলাল হোসেনের মতো লেখকেরা নিয়মিত অণুগল্প রচনার পাশাপাশি প্রবন্ধমূলক লেখা প্রকাশ করে বাংলা অণুগল্পের চর্চাকে আরো তাত্ত্বিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। এই দেশে 'অণুগল্প' নামক আন্তর্জালিক মাধ্যমে অণুগল্প চর্চার প্রসার ব্যাপক রূপ লাভ করে। ডিজিটাল মাধ্যম হওয়ায় অণুগল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে।

বাংলা অণুগল্পের চর্চা কেবল মাত্র পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে প্রসার লাভ করেছে এমন নয়। বিভিন্ন ডিজিটাল প্লাটফর্মে অণুগল্পের ব্যাপক চর্চা চলছে। 'গল্পের সময়', 'আদরের নৌকা', '৪ নং প্লাটফর্ম', 'কিশলয়', 'কেয়াপাতা', 'জয়ঢাক', 'সচলায়তন' ইত্যাদি মাধ্যমে অণুগল্প লিখতে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। পত্রিকায় নির্দিষ্ট পাতা থাকায় সবার পক্ষে লেখা সম্ভব হয়না। নবীন লেখকেরা কাঁচা হাতের লেখা প্রকাশের স্থানাভাব বোধ করে। এই স্থানাভাব পূরণ করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম।

অণুগল্পের শব্দ সংখ্যা কম হওয়ায় বাঞ্ছনীয়। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে মাত্র ছটি শব্দে অণুগল্প লিখেছেন। বনফুল কমবেশি দুইশত শব্দের মধ্যে অণুগল্প লিখেছেন। সাধারণত এক থেকে দুই পৃষ্ঠার মধ্যে অণুগল্প সার্থক ভাবে প্রকাশিত হয়।

বাংলা অণুগল্পের প্রসারে লেখক, পত্রিকা, গ্রন্থ এমনকি ডিজিটাল মাধ্যমও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। অণুগল্পের গন্ডি পশ্চিমবাংলা ছেড়ে বাংলাদেশেও বিস্তার লাভ করেছে। এই আলোচনায় অণুগল্পের চর্চার বহুমাত্রিক দিককে সর্বজন সমক্ষে উন্মোচিত করবে।

যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ : বিষ্ণু দে-র কবিতা

সুরজিৎ প্রামাণিক
পিএইচ.ডি.গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতার আলোচনায় সর্বাধিক প্রচলিত যে নামগুলি, বাঙালি কবিতা পাঠক উচ্চারণ করে বারবার, বিষ্ণু দে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রবল প্রতাপান্বিত সময়ে আবির্ভূত হয়েও, রাবীন্দ্রিক মায়ার চাদরে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েননি তিনি। প্রকারান্তরে বাংলা কবিতার বিস্তীর্ণ আকাশে নতুন নক্ষত্রলোকের সন্ধানে অহরহ নিমগ্ন করতে পেরেছেন নিজেকে। বিশ্ব সাহিত্যের পাঠক বিষ্ণু দে, জল- মাটি- রস ও রৌদ্রের কথা লিখতে গিয়ে, ব্যক্তি-চৈতন্যের আনাগোনায় অসামান্য সাধ ও সাধ্য দেখিয়েছেন কাব্যিক অবকাশে। অদ্ভুত সময়ের অবক্ষয় জুড়ে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর উষালগ্নের জরিপ নির্মাণ করে গেছেন স্বতন্ত্র কাব্য-বোধের প্রবণতা। মানব-জীবনের সংকট-বিপন্নতা থেকে অহর্নিশি উদ্ভূত হাহাকার, তাঁর কবিতার পথ যেমন প্রশস্ত করেছে, তেমনি জাগতিক পৃথিবীর রক্তলোলুপ মানুষের উন্মত্ত বিমূঢ়তা কাটিয়ে, নিরন্তর মুক্তির নেশায় আচ্ছন্ন তীব্র ঘোরে, সতেজ শস্য প্রতিমার ছবি এঁকে যেতে পেরেছেন কবি বিষ্ণু দে, বাংলা কবিতার দিক-দিগন্তে। ফলে অবক্ষয় জর্জর সভ্যতার নির্জন আকাশ স্পষ্ট বিষাদের গহ্বরে ডুবে যাওয়ার আগে, প্রেমের গান জেগে থাকা দুঃস্থের মিছিলে প্রগাঢ় মুক্তির স্বাদ খুঁজে নেওয়ার তাগিদে বুঁদ হতে পারেন তিনি। কাজেই বিষ্ণু দে-র কবিতা যে, বাংলা কবিতার চিরকালীন সম্পদ একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। যিনি বন্ধু কিংবা বইয়ের আশ্রয়ে আলো জ্বালানোর আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তাঁর সুক্ষ কাব্য-বোধে নিমগ্ন হতে পারলে পাঠকের চেতনার জাগতিক অন্ধকার কেটে গিয়ে, অনির্বাণ আলো জ্বলে ওঠে ঠিক।

বাংলা গানের রূপ ও রূপান্তরে সুরস্রষ্টা নজরুল

সুলগ্না চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সংগীতের ক্ষেত্রে নজরুল এক যুগন্ধর প্রতিভা। গানের অজস্রতায় ও সুরবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বাংলা কাব্যগীতির জগত। তাঁর প্রতিটি গান সুর বৈভবে, তালে ছন্দে, রাগ রাগিনীর আলপনায় ও ভাবৈশ্বর্যে এক একটি রত্নরূপে গণ্য। যে কোনোও সংগীতের মুখ্য আশ্রয়-কথা এবং সুর। সুরের ভাষা ও কথার ভাষার মিলিত রূপ ভাবের ভাষা।তাঁর সংগীত একদিকে যেমন সুরৈশ্বর্যে দ্যুতিময়, অন্যদিকে ভাবসম্পদ ও আবেগ

প্রাবল্যে প্রাণবন্ত। নজরুলগীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর গান প্রধানত সুর-নির্ভর। আবেগময় কাব্যিক কথা সংযোজনে গান মৌলিক গতিশক্তি লাভ করে সহজ ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। এ জন্য তাঁর গানে প্রাণের স্পর্শ থাকে যা শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করে। তিনি তাঁর সুরসৃষ্টিতে সুরের কাঠামো নির্মাণে তিনটি প্রধান উপায় অবলম্বন করেছিলেন- রাগ মিশ্রণ, একটি নির্দিষ্ট রাগের রূপ গ্রহণ এবং নবরাগ সৃজন।সুরের সন্ধানে তিনি নব নব সুরসৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।নজরুলসঙ্গীতে সুরের গভীরতায় এবং ভাষা তথা বানীর সুনিপুণ বহমানতায় ভাব ও রস দ্বারা বাংলা গানের সীমানা প্রসারিত হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর আত্মজীবনী – আত্মআবিষ্কারের শিল্পরূপ

সুলগ্না ব্যানার্জী

গবেষক, বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্ব-শাসিত)

কবি হিসাবে তাঁকে বেশি চিনলেও প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর শাণিত পদক্ষেপ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন, রবীন্দ্র-প্রতিভার গুণমুগ্ধ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। জ্ঞানশিক্ষাচর্চায় বড়ো হয়ে ওঠা বুদ্ধদেবের প্রবন্ধসাহিত্যে লেখনী ছিল ক্ষুরধার। বিষয় বিন্যাসের দিক থেকে তাতে সমালোচনা ও রম্য রচনা অগ্রাধিকার পেলেও পরবর্তীকালে সংযোজিত 'আত্মজীবনী' মূলক রচনাগুলি মৌলিকত্বে ভাস্বর। রচনাগুলিতে আছে প্রতিভার দীপ্তি, উপলব্ধির গভীরতা, প্রার্থিত নৈর্ব্যক্তিকতা, কবির অন্তর্দৃষ্টি, অতন্দ্রশিল্পীসত্তা, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি, আধুনিক মন, চিন্তার স্বচ্ছতা ও গদ্যের সুঠাম সাবলীলতা সহজ সৌন্দর্য। 'আত্মজীবনী' রচনায় ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি সৃষ্টিশীলতার প্রেরণাও প্রকাশ পেয়েছে বুদ্ধদেব বসুর লেখনীতে। দেশ-কালের পটভূমিকার পাশাপাশি সাহিত্যরস সম্বলিত হয়েছে রচনাগুলি। তাঁর এই লেখাগুলির মধ্যে মহৎজীবন, কবি হয়ে ওঠার কাহিনী ধরা পড়েছে। 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে তিনটি অধ্যায়- 'আমার ছেলেবেলা', 'আমার যৌবন', 'আমাদের কবিতাভবন'। এই আলোচনায় বুদ্ধদেবের আত্মোন্নতির সঙ্গে সমকালীন সাহিত্যের গতিবিধিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

অন্ন সংকট : 'নিম অন্নপূর্ণা', 'জাতুধান' ও 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'

সুস্মিতা ঘোষ

এম.এ, বি.এড

অর্থনৈতিক সংকট মানুষের মানবতাকে নষ্ট করে। মানুষকে মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে সমপর্যায়ে নামিয়ে আনে। বেঁচে থাকবার ঐকান্তিক প্রয়াসে মানুষ হারিয়ে ফেলে তার মানবতা, মূল্যবোধ, মনুষ্যত্বের মতো গুণাবলি। বিশ্বযুদ্ধ, কালোবাজারি, মজুতদারির মতো সংকটময় পরিস্থিতিতে এই অর্থসংকট বাংলার বুকে বিপর্যয় নিয়ে এসেছিল। হাজার হাজার মানুষ নিরন্ন দিনযাপনে বাধ্য হয়েছিলেন। কিছু সুবিধাভোগী বিত্তবান মানুষের চক্রান্তে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন সমাজের খেটে খাওয়া মানুষদের একটা বড়ো অংশ। বিত্তগত অবস্থানের বদল ঘটেছিল নিমেষে। মধ্যবিত্তের স্তর ছেড়ে নিম্নবিত্তের স্তরে অবনমন ঘটেছিল অবলীলায়। আর নিম্নবিত্ত স্তরে অবস্থান করা সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সামিল হয়েছিল অন্নহীনের মিছিলে কিংবা তিলে তিলে পতিত হতে হয়েছিল মৃত্যুমুখে। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকবার মরিয়া চেষ্টার ছবি ধরা পড়েছে সাহিত্যের পাতায়। কালো কালো অক্ষরে লিখিত হয়েছে সভ্যতার কালো অধ্যায়। তেমনই তিনটি গল্প 'নিম অন্নপূর্ণা', 'জাতুধান' ও 'গরমভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'। অন্নসংকটের প্রেক্ষিতে মানুষের লড়াই ও সামাজিক পরিস্থিতির জীবন্ত দৃষ্টান্ত এই গল্পগুলি। বাংলা সাহিত্যের তিন খ্যাতিমান গল্পকারের তিনটি গল্পের প্রেক্ষিতে সেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক সংকটের স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করা হলো।

ব্রতকথা ও পাঁচালি - নারী ও সমাজ

সুস্মিতা সাহা

অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজ, কলকাতা

কবি কৃত্তিবাস বিদগ্ধ পন্ডিত, অনুবাদ করছেন জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ, সহজ সরল বাংলা ভাষায়। কাব্যের নাম দিচ্ছেন 'শ্রীরাম পাঁচালি', শুধুমাত্র পড়ার জন্য নয় - এটি গেয় কাব্য অর্থাৎ যে কাব্য গান গেয়ে সকলের মনের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। আরেক কবি ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুর কাব্যের প্রথমেই পাই—

"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া"।

এই হোলো পাঁচালির মাহাত্ম্য।

এক মুখের থেকে কথা বা ছড়া বা গান ছড়িয়ে পড়ে দশ মুখে - এই পদ্ধতির উপর ভর করেই গড়ে উঠেছে বেঁচে আছে অধিকাংশ লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত। মধ্যযুগের কাব্য থেকেই তার সূচনা বলা যেতে পারে। গ্রাম বাংলায় তো বটেই - শিষ্ট সমাজেও পাঁচালি অথবা পালাগান যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেছে। এই পাঁচালি নিয়ে আমার আজকের প্রবন্ধ।

শামসুর রাহমানের কবিতা : প্রবহমান জীবনের মন্তাজ

সুস্মিতা সাহা

গবেষক, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

"যখন- তখন
মনের আপন ঘাঁটি ভীষণ প্রকম্পিত।
এখন আমি কারুর কোথাও যাবার কথা শুনলে হঠাৎ চমকে উঠি।"

(এখন আমি, 'এক ধরনের অহংকার', প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫)

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সাহিত্যের যে একটি স্বকীয় জগত রয়েছে তা তার ঘটনা বহুল রাজনৈতিক ইতিহাসই হোক কিংবা প্রকৃতি নির্ভেজাল সংস্পর্শেই হোক এ কথা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক মাত্র সকলেরই জ্ঞাত। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বারে বারে আলোচনার মুখ্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠে এসেছেন যেন পাঁচের দশকের একজন বিশিষ্ট কবি শামসুর রাহমান যিনি অনেক বেশি কবিতা মহলের অভিভাবক স্বরূপ,আসলে কোন প্রকৃত কবিকেই হয়তো বিভাজন-বিভেদ-দশক-শতক এসব কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধকরণ সম্ভব হয় না,ফলত কবিতা পাঠের ভাব পটভূমি, কবির প্রবহমান জীবনের ইতিবৃত্ত সবকিছুকে ছাপিয়ে কালের মাত্রায় রসোত্তীর্ণতা অনায়াসলব্ধ হয়ে ওঠে নানা প্রকার সমালোচনাকে নস্যাৎ করেই,অন্তত উপরিউক্ত পংক্তিদ্বয় তেমনিই স্বাক্ষর বহন করছে। কবি বলেছেন – "প্রত্যেক মানুষের জীবন একটি ওডেসি।" এই 'ওডেসি'র নানা ঘটনাবহুলতা, বৈচিত্রতা কতখানি বর্ণময় এবং তা কতখানি কবিতাতেও বিস্তৃত সে কথাই আমাদের আলোচনা সাপেক্ষে বিচার্য।

নবজন্মতত্ত্বে 'লোকপুরাণ' : মনসামঙ্গল কেন্দ্রিক নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য

সৃজন দে সরকার

সহকারী গবেষক, দি এশিয়াটিক সোসাইটি

ছাত্র, বাংলা ও শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ধারা প্রবহমানকাল ধরে নিজেকে জায়মান রেখেছে মৌখিক সাহিত্য পরম্পরার মধ্যে দিয়ে। তাতে আধুনিককালের গতিপ্রকৃতি ও সামাজিক অবস্থান একটি স্পষ্ট দ্বিবিভাজিত রূপরেখা নির্মাণ করে দিয়েছে- তাতে একটি হল মৌখিক পরম্পরা বাহিত সাহিত্য, অন্যটি লিখিত বা শিষ্ট সাহিত্য। আমাদের প্রকল্পের অভিমুখ দ্বিতীয়টির দিকে হলেও, আমরা মূলত প্রথমটির বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দ্বিতীয় ধারাটিকে শনাক্তকরণের চেষ্টা করতে পারি। সেখানে, আমাদের মূল অবলম্বন একটি জনপ্রিয় মঙ্গল কাহিনির পাঠ-ভেদযুক্ত আখ্যান 'মনসামঙ্গল'।

আমাদের প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব, কিভাবে একটি মানব সমাজ গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে একটি ভয় ও ভীতিকে কেন্দ্র করে একটি সপ্রোথিত কাহিনির মূল সমাজে গড়ে ওঠে। সেখানে একটি সমাজের ভূমিকা ও মানুষ হিসেবে একজন থেকে একটি গোষ্ঠীর ভূমিকা কীভাবে প্রভাবিত করে তোলে সেই কাহিনিকে। এই বিচারের মধ্যে দিয়েই প্রায়-ঐতিহাসিক কালের থেকে বিষয়টিকে দেখতে ও অনুধাবন করতে চাওয়া হবে। পাশাপাশি, দেখানো হবে সেই অনুধ্যানের মধ্যে দিয়ে কীভাবে পরম্পরাগত বিন্যাসের পর্যায়ে সেটি অভ্রান্তিমূলক পদ্ধতিগত বিচারের মানদণ্ডে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়ে চলে পরবর্তী সময়ে, গোষ্ঠীতে এমনকি সম্প্রদায়ের থেকে সম্প্রদায়ে।

এই বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে মনসামঙ্গল কাহিনির নানা দিক উঠে আসবে, সেগুলিকে বিচারের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী স্তরের পর্যালোচনায় আসবে। সেখানে অবশ্যম্ভাবী বিষয় হিসেবে চলে আসবে মিথের পুনর্জন্মের সূত্রগুলি। সেটি স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের পর্যায়ে না গিয়ে- সরাসরি আমাদের পরিকল্পিত ও প্রকল্পিক মিথের পুনর্জন্মের প্রেক্ষাপটগত ক্ষেত্রটিকে আলোচনা করা হবে। সেখানে পটভূমিকা হিসেবে কীভাবে সেটি শনাক্ত করতে পারা সম্ভব হয়, কীভাবে তাতে মিথের অগ্রসরতা ও বন্ধ্যাত্ব পরিমার্জিত রূপে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে রূপান্তরিত পর্যায়ের বিন্যাসকে সাবলীল করে নিতে পারে- সেই দিকটি বিচার করে দেখানো হবে।

বিশেষ করে, আমাদের প্রকল্পিত মিথের পুনর্জন্মের তত্ত্বটিকে মনসা কাহিনি বা মনসা উপাদানের সূত্রে- অর্থাৎ সর্পের আধারে প্রতিষ্ঠিত করে দেখানো হবে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রকে বিচারের পরিমণ্ডলে বিবেচনা করেই দেখানো যাবে- কীভাবে একটি মিথ সর্পিল অথচ প্রায় সমান্তরাল গতিপথের

নির্ভরশীলতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই নিজেকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করে নিতে সক্ষম হয়। সাপের খোলস ত্যাগের মধ্যেই সে হয়ে ওঠে নতুন, মিথও তেমনি সেই সর্পিল পথে নিজের খোলস ত্যাগের মধ্যে দিয়ে নিজেদের নতুন করে তুলতে সক্ষম হয়। এই মিথের নিজেকে নতুন করে তোলার অভিযাত্রার খানিক প্রকাশবহ রূপকে সন্ধান করে দেখা হবে নির্বাচিত কিছু সাহিত্যের নিরিখে। এভাবেই, প্রস্তাবিত ও প্রকল্পিত মিথতত্ত্বের প্রায়োগিক ভূমিকা সম্পূর্ণ করার সম্ভাবনা সূচিত হবে।

সুকুমার রায়ের সাহিত্য : খেয়ালী কল্পনা ও ব্যঙ্গ চিত্রের সমাহার

ড. সোনালী গোস্বামী

SACT1, হিজলী কলেজ, খড়গপুর

সুকুমার রায় হলেন বাংলা শিশুসাহিত্যের জগতে ধ্রুবতারা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও বিধুমুখীর পুত্র সুকুমার, পিতার সাধনাকে বাস্তবায়িত করতে, শিশুসাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। বাংলা শিশুসাহিত্য তাঁর হাতেই চিরায়ত রূপকথা - উপকথার রহস্য রোমাঞ্চ অতিক্রম করে পেয়ে যায় স্বতন্ত্র এক আজব জগৎ। যেখানে অসম্ভব সব কাজের মধ্যেই দেখা যায় সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত। হাসি-মজা আর কৌতুকের অপূর্ব পরিবেশনে তিনি মাতিয়ে তুলেছিলেন বাংলার শৈশব - কৈশোর।

শিশু সাহিত্যে সুকুমারের কৃতিত্ব ননসেন্স সাহিত্য বা উদ্ভট সাহিত্যের অবতারণায়। এক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য বরাবর তুলনীয় এডওয়ার্ড লিয়রের লিমেরিক গুচ্ছ এবং লুইস ক্যারলের 'স্বপ্নালোকিত অদ্ভুত অবৈধ অসামাজিক উল্টো নিয়মের' সঙ্গে। যদিও বুদ্ধদেব বসু তাঁকে চেস্টার্টনের সঙ্গেই এক আসনে বসানোর পক্ষপাতী। ক্যারল ও লিয়রের মতোই সুকুমারের ছিল 'লজিকনিষ্ঠ মনের সঙ্গে খামখেয়ালি মেজাজ'। সুকুমার রায় ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞানী ও লেখক। জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রই জানেন ছবির রাজ্যে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার কথা।

সাহিত্যক্ষেত্রে সুকুমারের বড় অবদান কৌতুককে সাহিত্যের আসরে মর্যাদা দান করায়। সুকুমার তাঁর সাহিত্যে সৃষ্টি করেছেন একাধিক কাল্পনিক উদ্ভট প্রাণীকুলের। আর রেখায় স্পষ্ট করলেন তাদের অবয়ব। যা একদিকে যেমন বিজ্ঞানের 'Xenotransplanatation' এর প্রতি পাঠকের সচেতন মনোযোগ আকর্ষণ করে, অন্যদিকে, আবার তা 'বিষ্ণুপুরাণ' এ বর্ণিত বিষ্ণুর একাধিক অবতারের রূপ বর্ণনায়, অথবা 'রামায়ণ'-'মহাভারতে'র একাধিক চরিত্রের রূপ বর্ণনায় এজাতীয় দ্বৈতরূপের কথা আমাদের স্মরণ করায়। যার মধ্য দিয়ে তিনি শিশুর মনে পুরাণপাঠের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখলেন। আজ যেসব প্রাণীদের সুকুমারের সাহিত্যের সেই সব প্রাণীকুলই শিশুর অজান্তেই তার বোধির জগতে গড়ে নিচ্ছে স্থায়ী আশ্রয়।

ফলত বড় হয়ে পুরান কথিত প্রাণী ও মানুষের মিশ্ররূপ আর তাকে বিস্মিত করবে না। শিশুরা অনায়াসেই তখন তাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে পারবে এই সব ঐশ্বরিক তথা মহামানবিক মিশ্র চরিত্রদের।

সুকুমার রায় বিচিত্রদর্শন প্রাণীকুলের কথা বলে একদিকে যেমন ব্যাঙ্গ করেছেন খামখেয়ালী, অনুকরণপ্রিয়, তোষামুদে মানুষদের। অন্যদিকে বাতিকগ্রস্ত একদল মানুষের চরিত্র অঙ্কন করে সামাজিক ভ্রান্ত সংস্কার ও ধারণাগুলিকে, চরিত্রের নানা ত্রুটি বিচ্যুতিকে তীব্র ব্যঙ্গের খোঁচায় বিদ্ধ করেছেন। আর প্রত্যেকটি বর্ণনা প্রান পেয়ে যায় তাঁর রেখার টানে। সুকুমার রায়, লেখায় ও আঁকায় মানুষের যেসব ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছেন তা বাংলা কার্টুনের প্রাথমিক নিদর্শন হিসেবে ধরা যেতে পারে। শুধু কার্টুন নয়, বাংলা কমিক্স এরও ইঙ্গিত মেলে সুকুমারের সাহিত্যে। তিনি যখন বলেন, 'ছবির টানে গল্প লিখি, নেইকো এতে ফাঁকি/ যেমন ধারা কথায় শুনি হুবহু তাই আঁকি।' তখন লেখার জন্য ছবি না ছবির জন্য লেখা বোঝা দূরূহ হয়ে ওঠে। তাঁর 'ও বাবা', 'বুঝবার ভুল' প্রভৃতি এজাতীয় কমিক্সধর্মী রচনার উদাহরণ। রচনায় ও চিত্রকলায় সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর সৃষ্ট অননুকরণীয় সাহিত্য ও চিত্রগুলি বাঙালী জাতিকে সর্বজাতীয় স্তরে সাফল্যের শিরোপা দান করে।

মধ্যযুগের বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট : প্রসঙ্গ মঙ্গলকাব্য

সোহম চ্যাটার্জ্জী

(S.A.C.T), **বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ**

স্বামী নিঃসম্বলানন্দ গার্লস কলেজ

ভদ্রকালী, হুগলী

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য গুলি এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি। দেশ ও সমাজের দুরাবস্থার কালে সাধারণ মানুষের বরাভয়দাতা রাজণ্যশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফলে বহিঃশক্তির আক্রমণ ও নিপীড়ন থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার মত কেউ আর ছিল না। এই পরিস্থিতিতেই দেব-বাদের আবির্ভাব। রাজন্যশক্তি যখন হীন, রাজার কাছে যখন কাঙ্খিত নিরাপত্তা পাওয়া যায় না তখন অসহায় সাধারণ মানুষের দেবতার শরণ নেওয়া ছাড়া আর গতি থাকে না। এই পরিস্থিতিতেই মঙ্গলকাব্য গুলির সৃষ্টি। খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালই বাংলা মঙ্গলকাব্যের সূচনা, সমৃদ্ধি ও পরিণতির কাল। এই পাঁচশ বছরের কালসীমায় বাংলার আর্থ-সামাজিক চিত্রটি তার যাবতীয় রূপান্তর সহ বাংলা মঙ্গলকাব্যে বিবৃত হয়ে আছে। নরখন্ড রচনার সুবাদে মঙ্গল কবিদের কল্পনা মৃত্তিকালগ্ন হয়ে পড়তো এবং সেই সূত্রেই মঙ্গল কবিরা নিজেদের সামাজিক অভিজ্ঞতাকে কাব্যের ভাষায় ভরিয়ে তুলতেন। তুর্কী

আক্রমণ পরবর্তী সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক চিত্রের পাশাপাশি দ্রুত বদলে যাচ্ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। সেই সময় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হত মূলত দুটি ধারায়— ১) কৃষি নির্ভর অর্থনীতি এবং ২) বাণিজ্য নির্ভর অর্থনীতি। ইতিহাসের সূত্রেই আমারা জানতে পারি খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতকে বাংলা ইসলাম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হলেও বাংলার সামাজিক চিত্র খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। তুর্কী-আফগান শাসন পেরিয়ে মুঘল আমলেও বাংলা ও বাঙালি তার সামাজিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। সমাজ ব্যবস্থায় জাতি ভেদ প্রথা ছিল অক্ষুন্ন। সমাজ কাঠামোয় চতুর্বর্ণীয় জাতি ভেদ প্রথার এক বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্য গুলিতে। তৎকালীন বাংলাদেশে সমাজের তথা একক পরিবারের কাঠামো ছিল একান্নবর্তী। পরিবারের কর্তা ছিলেন পিতা, পিতার অবর্তমানে বড় ভাই। সমাজে একদিকে বহুবিবাহ; অন্যদিকে নারীর ক্ষেত্রে সহমরণ প্রথা স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছিল অসাম্য। এ হেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় বহুগামী পুরুষ বারেবারেই নারীর সতীত্বের পরীক্ষা নিয়েছে। প্রবন্ধের বিস্তৃত পরিসরে এই পাঁচশ বছরের কালসীমায় প্রচলিত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি প্রকাশিত হবে বলে আশা রাখি।

মুক্তিস্বাদ আস্বাদনে নারী : প্রসঙ্গ পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক

সৌভিক পাঁজা

গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

অনেক অভিযোগ নিয়ে তিলে তিলে মৃত্যু বরন করেছে একাধিক নারী। সমাজ তা মনে রাখে না। মনে রাখতে চায়ও না। কিন্তু আজ নারী তিলে তিলে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে অধিকার সচেতন। কাজের মেয়ে কাজের ফাঁকে শিক্ষিত হয়ে উঠছে। মাথা নত করে নয়, লড়াই করে বাঁচবে বলে। মা ছেলের অত্যাচার সহ্য না করে ছেলেকে হত্যা করে অপরিচিতের হাত ধরে সাথী ও সঙ্গী হয়ে বাঁচতে চেয়েছে। স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে থাকা নারী আজও নির্যাতিত হয়। তার সুবিচার অনেক সময় হয় না, রাজনীতির কুচক্রে। এই চক্র ভেদ করে বর্তমানে সুবিচার সম্ভব হয়েছে, নারী শক্তির হাত ধরে। পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকীয় সংলাপে উঠে এসেছে মুক্তিস্বাদ আস্বাদনে নারীর নানান প্রসঙ্গ।

সাহিত্যের সংস্কার, সংস্কারের সাহিত্য : ইতিহাস নির্মাতা বিদ্যাসাগর

সৌমিতা মুখার্জী
আরামবাগ, হুগলী
গবেষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অক্ষয় অম্লান গৌরব উজ্জ্বল সিংহদ্বার যিনি স্বহস্তে উন্মোচন করলেন তিনি নবজাগরণের প্রাণপুরুষ বিদ্যাসাগর। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশাল আকাশে তিনি ধ্রুবতারার মতো শাশ্বত ইতিহাস, কালের মধ্যে মহাকালের নির্মাতা। যিনি ইতিহাসকে স্থাপন করলেন ব্যক্তিত্বের প্রয়াসে, মেরুদন্ডের দুর্নিবার কাঠিন্যে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশাল ক্ষেত্রভূমিতে বিদ্যাসাগরই প্রথম বপন করলেন শিক্ষা বিস্তারের মূল স্বরূপ কল্পতরু। দীনবন্ধু মিত্র 'দ্বাদশ কবিতা' (১৮৭২)- য় উৎসর্গ অংশে লিখেছেন – "আপনি বর্ত্তমান বঙ্গভাষার জনক, বঙ্গভাষা আপনার তনয়া।"

'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'জীবনচরিত', 'বোধদয়', 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'চরিতাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিকে শিশুপাঠ্য হিসাবে সরল অথচ বুনিয়াদি স্বরূপটি তিনি সুদৃঢ় করতে চেয়েছেন। 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' ইত্যাদি অনুবাদমূলক সাহিত্য রচনায় ভাবের প্রবাহে এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যাতে মনোহারিত্ব এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে। শুধু বাংলা ভাষা নয়, সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাকরণাদি জটিল বিষয়কে বাংলাভাষায় সংক্ষেপে বর্ণনামণ্ডিতরূপে সুচিত্রিত করেছেন যাতে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত শিক্ষা দুর্বোধ্যতার কুজ্ঝটিকা থেকে বিমুক্ত হতে পারে। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তীকালের সাহিত্য ভাষায় ভাবের প্রবাহ ক্ষণে ক্ষণে যে বাধা পেত, বিদ্যাসাগর তাতে আনলেন স্বচ্ছন্দতা, সজীব প্রাণবন্ত শক্তিময়তার সঞ্চার। কেবল সাহিত্যে সংস্কারসাধন নয়, নানাবিধ সামাজিক কুপ্রথা-স্থবিরতা-ভন্ডামির বিরুদ্ধে এনেছিলেন সংস্কার সাধনের বিশুদ্ধ গঙ্গাজল যার স্পর্শে মুক্তি পায় অসহায় নির্যাতিত প্রাণ। বিধবা বিবাহ – বাল্যবিবাহ – বহুবিবাহ ইত্যাদির মতো সামাজিক বর্বরতার বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম অশ্বমেধ যজ্ঞের রাশ ধরলেন। তারপর তর্ক-যুক্তি-শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা মিথ্যাচার খণ্ডন দ্বারা অপসংস্কৃতির যাবতীয় অন্যায় ও কুপ্রথাকে সমূলে ন্যায়সঙ্গত কুঠারাঘাত হানলেন, উত্তোলিত করলেন শাশ্বত মানবধর্মের ধ্বজা, আর এই কঠিন প্রাণের ভাবের বাহন হয়ে উঠলো বাংলাভাষা। সাহিত্য সেখানে অন্যতর রূপ পেল সুতীব্র প্রতিবাদে, কখনো বেনামে শাণিত রসিকতার আবার কখনো ইঁটের পরিবর্তে পাটকেলের তুল্য তীক্ষ্ণ যুক্তিজালের পরিকল্পিত সজ্জায়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই বাঙালীর যুগ যুগ ধরে সেই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিনী লীলায় আশ্চর্যের অবধি নেই। তাঁর ভাষা শিক্ষা সমাজসংস্কার আজ ইতিহাসের সামগ্রী গুল্মঘন প্রান্তরের মহাতেজস্বী বনস্পতি সম বিদ্যাসাগর যুগপৎভাবে প্রচলিত প্রানহীন স্থবির সাহিত্যের সংস্কার করেন তেমনি আবার সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সাহিত্যকে করে তোলেন প্রতিবাদের মাধ্যম তথা যুগপ্রেক্ষিতে সুতীক্ষ্ণ অব্যর্থ অস্ত্র।

কাশীদাসী মহাভারত : কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান

সৌমিলি দেবনাথ
পিএইচ.ডি গবেষক, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভারসিটি

কাশীদাসী মহাভারতে দেবগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে কচের পরিচয় প্রদান করা হয়েছিল। মহাভারত, মৎস্যপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণে এই কচ চরিত্রটির বর্ণনা মেলে। ভারতীয় পুরাণে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার মন্ত্র হিসেবে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের কাছে বৃহস্পতি পুত্র কচ সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই কচের প্রতি দেবযানীর আকৃষ্ট হওয়া এবং পরবর্তীতে বিবাহে সম্মত না হওয়ায় কচের প্রতি দেবযানীর ক্রোধ ও শাপ। আর সবশেষে ইন্দ্রের নগরে কচের প্রত্যাবর্তন।

জীবনানন্দের কবিতায় আত্মসমীক্ষণ : অনন্বয় থেকে সমন্বয়ের অভিমুখে যাত্রা

সৌরভ মজুমদার
গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে সমাজ ও সমসময় নিয়ে অবহিত থাকা কবিতা রচনার পূর্বশর্তরূপে বিশেষ পরিগণিত হত না। কবি ছিলেন এক গগনচারী সত্তার মতো গজদন্ত মিনারে শোভমান—শ্বাপদসঙ্কুল এ বিশ্বের গোভাগাড়ে তাঁকে খাদ্য-বস্ত্রের মৌল চাহিদায় নেমে আসতে হয়নি, তাঁর কাব্যসুষমার গায়ে লাগেনি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ভয়াবহ সংগ্রামের আঁচ। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে কবি আর জগৎপ্রমারার দূরবর্তী দর্শকরূপে নিজের পার্থক্য বজায় রাখতে পারলেন না; অন্নবস্ত্রের প্রতিযোগীরূপে জনতারই একজন হয়ে পড়ায় তাঁর কবিতাতেও বিশ্বপ্রপঞ্চের সুতীক্ষ্ণ ছায়াপাত ঘটল, আর সচেতন মননের দর্পণে আত্মসত্তা ও স্বশ্রেণির স্বরূপের নির্মম প্রতিফলন রূপায়িত হল কাব্যপ্রতিমায়। নবলব্ধ এই সমীক্ষণাত্মক চেতনায় কবিতা রচনা শুরু করেন বিশ শতকের তিনের দশকের বাঙালি কবিরা, যাঁদের অন্যতম হলেন জীবনানন্দ দাশ(১৮৯৯-১৯৫৪ খ্রি.)। পারিপার্শ্বিক সমাজমানসে মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত হতাশায় প্রাথমিকভাবে নিজেকে বহির্বিশ্ব থেকে পৃথক করে নিতে চাইলেও তাঁর অন্তর্নিহিত শুভচেতনা তাঁকে সমাজবিমুখ হয়ে পড়তে দেয়নি—দ্বৈপযাপনে অভ্যস্ত মানুষের স্বার্থপরতা, ক্রূরতা, নির্মমতা, পলায়নপরতার ওপারে তার শাশ্বত রূপের, তার অনন্ত সত্তার প্রকাশেও তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। আত্মসমীক্ষণ চেতনার প্রকাশে তাঁর কবিতা কীভাবে সমসময়ের একটি প্রকৃষ্ট দর্পণ হয়ে উঠেছে, তা আলোচিত হবে বর্তমান প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

অভিজিৎ সেনের রহু চণ্ডালের হাড় : বাজিকরদের জীবনের উপাখ্যান

স্বপন রানা

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

অভিজিৎ সেন তাঁর 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে বাজিকর সম্প্রদায়ের দেড়শো বছরের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন। বাজিকর সম্প্রদায়ের মানুষেরা আদি পুরুষ রহুকে দেবতার আসনে বসিয়েছে। কারণ রহু এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাদের বিশ্বাস রহু সবসময় তাদের উপর কৃপাদৃষ্টি বর্তায় রেখেছেন। বাজিকর সম্প্রদায় যাযাবর ভাবে জীবন কাটালেও তাদের মধ্যে থিতু হওয়ার তীব্র বাসনা আছে। বিশেষত পীতেম, চরিত্রের মধ্যে সেই বাসনা তীব্র। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তাদের বারবার বাসা বেঁধেও দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াতে হয়েছে নানাকারণে। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি বাজিকরের দল রহুর অস্তিত্ব ভুলে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তাদের জীবনচর্যার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তারা নিজেদের সম্পূর্ণ ভাবে গৃহস্থ করতে চেয়েছে। তারা সাধারণ গৃহস্থ মানুষের মতো রেশনের সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে। তাদের কেউ কেউ শহরে নানান কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। বাজিকরদের এক নতুন আত্মপরিচয় ঘটার মধ্য দিয়ে কাহিনীর যবনিকা পতন ঘটে।

বঙ্গে গাজন উৎসব

স্বপন হাজরা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ

বাংলায় মূলত দুই ধরনের কৃষিভিত্তিক উৎসব হয়- ১. কৃষি পূর্ববর্তী উৎসব, ২. কৃষি পরবর্তী উৎসব। গাজন হল প্রথম ধরনের। চৈত্রের সময় থেকে শুরু করে বর্ষার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত সূর্য যখন রুদ্রময় মূর্তি ধারণ করে, তখন সূর্যকে তুষ্ট করার জন্য ও উপযুক্ত বৃষ্টির আশায় কৃষকেরা গাজন উৎসবের প্রচলন করে। এক সময় সূর্য বন্দনাকে কেন্দ্র করে যে গাজন উৎসব শুরু হয়েছিল, সেখানে সামাজিক কৌলিন্যকে ভেঙে বহু মানুষ একত্রিত হত তা আজ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গেলেও উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু স্থানের পাশাপাশি বিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলে এটি এখনও মহোৎসব হিসেবে পালিত হয়ে চলেছে। সেই দিকে দৃষ্টিপাত করে আমরা আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে মালদহ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলার বিভিন্ন গাজনের পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

স্বরূপ দে

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

হিজলী কলেজ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার। তিনি একজন বৈশ্বিক লেখক। তাঁর খ্যাতি মূলত একজন কথাসাহিত্যিক হিসেবে হলেও নাট্যরচনায় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যায়। বাংলা নাটকে অ্যাবসার্ড নাটকের স্রষ্টাও তাঁকে বলা চলে। তিনি কল্লোলীয় কালপর্বকে অতিক্রম করে ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে, ইউরোপীয় আধুনিক তাকে বাংলা নাটকে অঙ্গীভূত করান। তাঁর নাটকের সংখ্যা মাত্র চারটি। যথাক্রমে তা হল 'বহিপীর', 'উজানে মৃত্যু', 'তরঙ্গ ভঙ্গ', ও 'সুড়ঙ্গ'। 'বহিপীর' নাটকে তিনি ধর্মধ্বজা, ধর্মভীরু, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। মহাপীর প্রথার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছেন। 'উজানে মৃত্যু'তে তুলে ধরেছেন গল্পের মধ্য দিয়ে অনুষঙ্গহীন বিষয় ভাবনাকে, 'তরঙ্গভঙ্গে' উঠে এসেছে আমেনা নামক চরিত্রের নির্মম হত্যাকারীর কাহিনি ও বিচারকের অসহায় অবস্থার কথা। পরিণামে ঘটেছে আক্ষেপরত বিচারকের আত্মহত্যা। 'সুড়ঙ্গ'তে প্রকাশ পেয়েছে অ্যাবসার্ডিটির প্রসঙ্গ। ফলত নাট্যকার হিসেবে তিনি কখনো প্রকৃতিবাদী, কখনো পর্যবেক্ষণবাদী আবার কখনোবা অভিব্যক্তিবাদী। নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্রকে তিনি আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসায় তুলেধ রেছেন। যেখানে হাতেম আলি, হাসেম আলী, তাহেরা, বহিপীর, আমেনা প্রতিটি চরিত্র নিজ নিজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে হয়েছে উজ্জ্বল। তাঁর নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য সমস্যা দিয়ে নাটক শেষ না করে, সমাধানের পথে নাটকের উদগীরণ ঘটানো। ফলত পঞ্চাঙ্ক কিংবা একাঙ্ক নাটকের কোন পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেননি। কিন্তু তাতে করে নাটকের গঠনশৈলী ও গতিময়তায় কোন বাধা পরেনি বরং বাংলা নাটকের নতুন পথের দিশা নির্ধারিত হয়েছে। যা বৈশ্বিক পাঠককে মনমুগ্ধময়তায় আবিষ্ট করেছে। যদিও এর পশ্চাতে ছিল বাংলা নাটকে তাঁর ইউরোপীয় নাট্যধারার সমন্বয়সাধন। তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কথাসাহিত্যের মতো নাটকের ক্ষেত্রেও যে বাংলা সাহিত্যের অগ্রদূত তথা পথিকৃৎ তা বলাইবাহুল্য।

Laso Mung and Lepchas' Fight for Survival: A Political Interpretation of Lepcha Movement in the Darjeeling District of West Bengal

Abhsihek Chakravorty
Assistant Professor of English & Doctoral Research Scholar
Department of Humanities
Midnapore City College
&
Dr. Arpita Raj
Assistant Professor of English & Head
Department of Humanities
Midnapore City College

The Lepchas are the indigenous tribe of the hilly regions of Darjeeling and Kalimpong in West Bengal. They have a long and deep connection with the land itself establishing their hold in the region ethnically regardless of the looming threat of the other mainstream cultures. Known as the 'Rongkups', the Lepchas believe themselves as the 'children of the snowy peak' representing a strong bond with hilly landscape of Eastern Himalayas. The Lepchas have been an integral part of Darjeeling region from the early 13th century. Though they have been occasionally threatened by other cultural groups from the hills and the plains of Bengal, still they have managed to survive against all odds. Their ability to survive and sustain is evident in their origin stories which are coming out of their enriched folk narratives. According to Lepcha myth, the indigenous ethnic people survived only after defeating the demon Laso Mung, an outcast. The objective of my paper will be to analyze the myth of Laso Mung and construct it as a tool for the Lepchas to establish themselves as a strong community belonging to the Bengal socio-cultural milieu.

Climatic Thoughts of Rabindranath Tagore: An Ecocritical Study

Agnidev Manna

UGC- Junior Research Fellow,

Department of History, Vidyasagar University

Ecocriticism is a literary approach that examines literature in the context of environmental issues. By studying Bengali literature from an ecocritical perspective, we can raise awareness about critical environmental concerns such as climate change, biodiversity loss, soil erosion, deforestation, air and water pollution, and toxic waste. Rabindranath Tagore, a great Nobel laureate writer and artist, was an environmentalist who deeply understood nature and its impact on humanity. The paper primarily focuses on Rabindranath's outlook on climate. His songs on nature capture the unique characteristics of each season in a lyrical and environmentally conscious way. Tagore demonstrates the intimate connection between climate, human emotions, culture, and material life through his works. Many of his songs in Gitanjali were written in Santiniketan and convey a profound spiritual perspective. Furthermore, Tagore's writings aimed to promote climate change awareness and suggested conservation efforts to combat environmental destruction. In this article, the focus is on Tagore's portrayal of the impact of seasonal variations on both human civilisation and the environment, as well as his insights into the issue of climate change awareness.

Understanding Colonial Bengal and Reconstructing Bengali Culture and Ethos, Through the Lens of Detective Fiction: Kaushik Majumdar's Mason Trilogy (*Surjotamosi*, *Nibarsaptak* & *Agniniroy*)

Ayan Dutta

Student of English, UG 6th Semester

Department of Humanities, Midnapore City College

In Kaushik Majumdar's Mason trilogy, we can see the use of chronotope, parallel storylines, and the presence of multiple narratives throughout the novels, to slowly reveal a vast conspiracy against the monarchy by those who were discarded by the mainstream society to subvert the power structure. The text brilliantly showcases the lives of some talented and skillful individuals from Colonial Bengal, who despite facing significant economic hardship, can run parallelly with their supposedly empowered Western counterparts. My objective is to find out how these texts showcase the social, economic, political, psychological, religious, gender, educational, and medical aspects of Bengal during Raj. The article will also analyze the crime committed in the text, the type of it, and people of which level of the 'societal hierarchy is behind it.' The paper will also ponder over the question, of whether the biases of racial superiority are getting challenged or the colonial mindset is simply allowing the native characters to bow in front of their colonial masters, in those select writings. I think analyzing Majumdar's representations of Bengal will lead us to recreate the psyche of all kinds of people who lived in Bengal, natives, colonizers, and the Anglo-Indians, and help us understand the atmosphere of Colonial Bengal in a truly multidimensional and multifaceted way.

Bengal Famine of 1943 and Indian People's Theatre Association (IPTA)

Bijoy Mandal

Assistant Professor, Department of Political Science

Midnapore College (Autonomous)

The Famine of Bengal was highly destructive in Bengal province. As far as causes are concerned famine are two types— man made and nature made mainly caused by dearth of rainfall, drought, flood, storm etc. These may bring about disasters effects resulting in famine. The famine of 1943 was fall out both man made and nature made disasters. Indian People's Theatre Association (IPTA) is the cultural front of Communist Party of India. It was founded in Mumbai in 1943. One of the aims of IPTA was to create consciousness of right among the masses through drama. Those who were dedicated to this cause, came forward and a number of new dramas were written and staged one after another. '*Aagun*' (fire) written by Bijan Bhattacharya in the backdrop of famine was staged in Star Theatre in 1944, after that, '*Jawanbandi*' written by Manoranjan Bhattacharya was staged. In this series most remarkable drama was '*Nabanna*'.

Partition and Vilification of Body : Exploring Violence against Marginalized Women in the Select Writings of Dalits in Bengal

Biswadeb Rajbanshi

Assistant Professor, Department of Humanities, Midnapore City College

Mass migration victimzed women, children and other during partition of Bengal in 1947. The polarity of power based on religion led the contemporary nationalists to choose the provision of religion. Being marginalized by gender, caste, class, Dalit women are the worst victims of violence and brutality during the Partition of Bengal in 1947. This paper is an attempt to explore how masculine

libidinous desires vilified marginalized women during the Partition of Bengal in 1947. To explore the interlinked violence against Dalit women and masculine lust for possessing their body, this paper considers Kapil Krishna Thakur's *Anya Ihudi* ('The Other Jew') as primary text. The theoretical framework of Post-colonial consciousness related to partition and violence against women and memory will be taken into consideration while elaborating the ideas in the texts.

Tiger of Bengal, A K Fazlul Haque in the Light of history

Sk. Ekramul Hossain

Ph.D. Research Fellow, Department of Folklore

The University of Kalyani.

Dr. Debalina Debnath

Assistant Professor, Department of Folklore

The University of Kalyani

The undisputed great leader of the Indian subcontinent is Abul Kashem Fazlul Haque. He is known as Sher-e-Bangla or the Tiger of Bengal for his political wisdom, foresight and immense courage. Fazlul Haque who possessed multi-talents undertook various programs including the expansion of education for the neglected classes, the emergence of Bengali nationalism and the abolition of the landlord system. He was the originator of the historic Lahore Resolution. He loved the deprived section of the society of the country from the bottom of his heart and sacrificed his life for their welfare. The purpose of my essay is to highlight the activities of this famous political person in the light of history.

A Brief Study of the Scientific Temperament, Ethical Sensibility, and Exploitative Aspects of it in Bengali Culture through Select Texts of Saradindu Bandyopadhyay

Ekta Kar

Student of English, UG 6th Semester

Department of Humanities, Midnapore City College

The writings of Saradindu Bandyopadhyay do not confine themselves to the tag of Detective Fiction only, as the author himself stated in an interview with a renowned journalist, Partha Chattopadhyay, of the Ananadabazar Patrika, that he wanted to write detective fiction with such sagacity so that its literary conscience can be preserved in an intellectual level. He also said that the stories of Byomkesh Bakshi can also be read as a social novel. Now, it also opens the door, to much more multidimensional and multifaceted interpretations, such as the study of Byomkesh as a science fiction, at least understand the elements of it and how it portrays the culture and lifestyle of a Bengal which is long gone, but is immortalized through literature – colonial Bengal. "*The Gramophone Pin Mystery"* deals with the 'brilliant mind' yet evil incarnate Prafulla Roy's genius 'instrument' of death and how it fooled the Calcutta Police. In "*Calamity Strikes*" on the other hand, is about the literary playfulness of the author, who keeps on giving clues to the reader in the name of 'blustering of the unsuccessful,' at the same time depicting the tragic reality of poverty gradually infiltrating and poisoning the ethical boundaries of Bengali, or rather Indian scientists for the damned need of survival. As both texts profusely symbolize the evil of science, it's my objective to understand the correlation between them as well as, how they foil each other. The goal is to define, how on a way bigger scale, the elements of science fiction in these two texts can lead us to a rediscovery of the social, economic, and political structure of the Bengali lifestyle of that time.

Kurmi Movement in Post-Colonial Bengal : A Social Survey of Jangalmahal

Somnath Rana,

Assistant Professor, Midnapore City College

Jangalmahal of West Bengal belonging to Chotanagpur Plateau region in East India is the home of various communities depending on nature. One of them is the Kurmis. Initially, they were enlisted as schedule tribe by the colonial government. However, in 1930 Kurmis came out of this list. One of the reasons for this was the desire of the Kurmis to achieve higher ethnic status. Several noble Kurmi people wanted to gain social status. They claimed to be Kshatriyas and started holding sacred thread (upavitas).But most of these people were economically backward. Their Life was largely dependent on nature. As a result, they were deprived from various facilities for a long time. After the establishment of an independent government in India, the Kurmis had high hopes, they thought the government will return their old caste status, but they are still in same caste status. After long time of independence they did not get back their old caste status. Although the government has identified these Kurmis as a backward class in West Bengal, they are not satisfied. That is why the people of this community organize themselves by raising their awareness. Time has come down to the path of movement. In various ways the Kurmis have tried to highlight their individual identity. They have taken special care in the development of Kurmali language besides various meetings and gatherings. From the past they tried to highlight the contribution of Kurmis for the country's independence. After the Sanskritisation, most of the Kurmis were unable to change their socio-economic condition. So they started Kurmi movement to establish their self-identity.

The Effect of Imperial Propagandas on the Conscience and Consciousness of Bengali People and Deconstructing the Usage of Subtext in Children's Literature: A Postcolonial Study of Satyajit Ray's *The Tree with Golden Leaves*

Subhranil Ghosh
Student of English, UG 6th Semester
Department Of Humanities

Satyajit Ray's writing over decades has touched the hearts of many Bengali children. It's quite common among young people of Bengal to feel nostalgic with the bare mention of Feluda and Professor Shonku as those texts offer their escapades, which drove the readers away with the protagonist to a land far away from them, sometimes crossing nations or even continents, such as Rajasthan, Hong Kong, Tibet and a Cemetery situated in Calcutta. Ray's "The Tree with Golden Leaves" talks about the glory of Indian Culture, an herb found in Charak Samhita, that 'other than a Kashi-based holy man, no one else has seen or heard of' turns out to be a 'miracle to cure all complaints, a pill to destroy all illness', which Herr Goring wanted to confiscate from Shonku, to analyze elements of it and use it only for the medicinal treatment of members who leads the Nazi Party. The objective of the article is to analyze the cultural appropriation of Indian culture by the authoritarian Nazi Party and Shonku's ingenious use of the stigmatized misconception about Indian Mysticism against the Germans. The paper will also try to focus on a much more multidimensional and multifaceted interpretation of the text to focus on how the political propaganda of Dorothy, poisons the conscience of Shonku about the value of German life, directly challenging the humanitarian approach to life taken by Tripureswar Shonku, Shonku's father. All in all, through this paper, I'll try to understand the subtext hidden in the story, the factor of Shonku being used as nothing but a political tool by both Germans and Britishers alike, in the war between themselves, but Shonku having the submissive mindset of a colonized native, failing to recognize the vile nature of British people, hiding behind the well-wishing dogma of 'the white man's burden'.

MIDNAPORE CITY COLLEGE

Recognized by UGC, DSIR, Govt. of India, Higher Education Department, Directorate of Medical Education, Govt. of West Bengal
& Affiliated to Vidyasagar University, The West Bengal University of Health Sciences

B.A. Honours Courses
Bengali, Sanskrit, History, English, Education

B.Sc. Honours Courses
Botany, Zoology, Nutrition, Geography, Mathematics, Chemistry, Physics, Computer Science

Under Graduate Professional Courses
4 Years B.Sc. in Fishery Science,
4 Years B.Sc. in Agriculture,
Bachelor of Computer Application (BCA)

M.A. Courses
Bengali, History, English, Education

M.Sc. Courses
Botany, Zoology, Nutrition & Dietetics, Food Science & Nutrition, Geography, Chemistry, Physics, Mathematics, Computer Science

Post Graduate Professional Courses
M.Sc. in Fishery Science,
M.Sc. in Agriculture (Agronomy)
M.Sc. in Agriculture (Genetics & Plant Breeding)
M.Sc. in Agriculture (Plant Protection)

Allied Health Science Courses
BBA in Hospital Management (BHM)
Master in Hospital Administration (MHA)

Paramedical Courses
Bachelor of Medical Laboratory Technology (BMLT)
B.Sc. in Medical Microbiology
B.Sc. Radiology & Imaging Techniques
M.Sc. in Medical Laboratory Technology (MMLT)
M.Sc. in Medical Laboratory Technology (Microbiology)
M.Sc. in Medical Laboratory Technology (Biochemistry)
M.Sc. in Medical Laboratory Technology (Haematology & Blood Transfusion)
M.Sc. in Medical Laboratory Technology (Adv. Pathology & Histopathology)
M.Sc. in Medical Microbiology
M.Sc. in Applied Nutrition

Education World
EW NON-AUTONOMOUS COLLEGES STATE RANKINGS 2023-24
10TH RANKED in West Bengal
59TH RANKED in India

University Grant Commission, Govt. of India
Department of Scientific & Industrial Research, Govt. of India
Higher Education Department, Govt. of West Bengal
Vidyasagar University, Govt. of West Bengal
Directorate of Medical Education, Govt. of West Bengal
The West Bengal University of Health Sciences, Govt. of West Bengal

Laboratories

Computer Lab

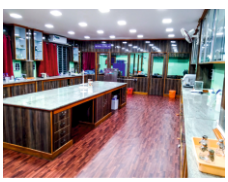
Microbiology Lab

Central Research Lab

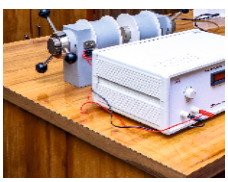
Physics Lab

Geography Lab

- Multi-cultural college truly diversified, drawing, students from diversified socio-economic strata across various states
- State-of-the-art infrastructure
- Nurtures holistic development with cultural & extra co-curricular activities
- High-End Laboratory with Research Opportunity
- Book Bank & E-Library
- Facility of fellowship for P.hD program from Government & College fund
- Facility of all Government and private scholarship

Midnapore City College secured 3rd rank for Kanyashree Scholarship in the academic session: 2020-21

Bhadutala, Midnapore, Paschim Medinipur, Pin- 721129, West Bengal, India
www.mcconline.org.in
+91 3222 291218 | +91 9547414192 | +91 8967598946 | +91 9932318368